প্রকাশনার ৮৫ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৬ ❖ ১২ -১৮ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

খ্রিস্ট-জুবিলী: আশার তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণ

জপমালা প্রার্থনা: মা মারীয়ার সহযোগে আমরা আশার তীর্থযাত্রী

মা মারীয়ার সাথে জীবনের পথে

মানুষের হৃদয়ে মা মারীয়া ভক্ত
মন্সিনিয়র দা কস্তা

প্রয়াণের পঞ্চম বর্ষ

প্রয়াত আব্রাহাম গিলবার্ট ফ্রান্সিস
জন্ম: ১ মে, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১০ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

"আঁখির আড়ালে চলে গেছ তবু
রয়েছ হৃদয় জুড়ে..."

প্রয়াত এরিক ফ্রান্সিস
জন্ম: ৪ মার্চ, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

দেখতে দেখতে পাঁচটি বছর পূর্ণ হয়ে গেল তোমরা চলে গেছ আমাদের আঁখির আড়ালে। তবুও প্রতিদিন প্রতিক্ষণে আমাদের মাঝে তোমাদের উপস্থিতি উপলব্ধি করি বিভিন্ন কাজে, কথায়, আনন্দ-উৎসবে এমন কি বিভিন্ন সমস্যায়ও। তোমাদের সহায়তা চাই। সম্মুখে না থাকলেও বুঝতে পারি ওপার থেকে আমাদের সাথে সক্রিয় রয়েছ। এভাবেই যেন তোমাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকি জনম জনম ধরে এপারে ওপারে। স্বর্গীয় শান্তি তোমাদের ঘিরে থাকুক।

তোমাদেরই
শোকার্ত ফ্রান্সিস পরিবার

বিজ্ঞ/২২৫/২৫

২৮তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত জন গমেজ
জন্ম : ১৪ নভেম্বর, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার
মৃত্যু : ১০ অক্টোবর, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার

তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

"মরণসাগর পারে তোমরা অমর,
তোমাদের স্মরি।"

প্রয়াত আলফ্রেড গমেজ
জন্ম : ১৭ মে, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৭ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

তুমি একদিন সকলকে আনন্দিত করে এসেছিলে এই ধরণীতে। আবার একদিন আমাদের সকলকে রাতের অন্ধকারে শোক সাগরে ভাসিয়ে চলে গেলে। কখন যে ২৮টি বছর পার হয়ে গেল আমাদের মনেই হয় না। তুমি চলে গেছো ঠিকই কিন্তু তোমার চিন্তা-চেতনা, তোমার মতাদর্শ, তোমার কীর্তি ও তোমার পথপ্রদর্শন আমাদের যেমন মনে করিয়ে দেয় তেমনি সমাজে অনেকেই তোমাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে এবং তা চিরদিন স্মরণ করবে।

ooooo

প্রিয় ভাই, দেখতে দেখতে তিনটি বছর চলে গেলো তুমি আমাদের মাঝে নেই। তোমাকে আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে স্মরণ করি।

পরিবারের পক্ষে—
কানন গমেজ

গমেজ বাড়ি, শুলপুর ধর্মপল্লী
সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ।

বিজ্ঞ/২২৬/২৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্ষ : ৮৫, সংখ্যা : ৩৬
১২ অক্টোবর - ১৮ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
২৭ আশ্বিন - ০২ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

রোজারিমালা প্রার্থনা হোক প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসীর নিত্য সঙ্গী

প্রতিটি ধর্মেই প্রার্থনার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রার্থনার ধরণ আলাদা হলেও প্রার্থনা করার অবিরাম আহ্বান সকল ধর্মেই রয়েছে। কেননা প্রার্থনা সেই শক্তি যা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করে। প্রার্থনা ব্যতীত খ্রিস্টীয় জীবনের পথ চলা কখনোই সহজ নয়। প্রতিদিনের ব্যস্ততা, ক্লান্তি, পৃথিবীর টানাপোড়নের ভিড়ে আমাদের পক্ষে অনেক সময়ই আত্মিক অনুশীলনের জন্য আলাদা করে সময় বের করা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু এর মাঝেই আমাদের মনে রাখতে হয় প্রার্থনা আমাদের আত্মিক জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস। আর এই প্রার্থনার মধ্যেই এক অনন্য স্থান দখল করে আছে রোজারিমালা প্রার্থনা। সহজ-সরল একটি প্রার্থনা, যা ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা দলগতভাবে করা যায়। এটি কেবল একটি ধারাবাহিক জপ করার পদ্ধতি নয়, বরং এক গভীর ধ্যান ও আত্মসমর্পণের পথ, যা মা মারীয়ার মধ্যস্থতায় আমাদেরকে যিশুর নিকট নিয়ে যায়।

অক্টোবর মাস কাথলিক বিশ্বাসীদের জন্য পবিত্র রোজারিমালার মাস। এই মাসে আমরা মা মারীয়ার মধ্যস্থতায় রোজারিমালা প্রার্থনার মাধ্যমে যিশুর জীবনের গভীর রহস্যসমূহ ধ্যান করি এবং আমাদের আত্মিক জীবনে নতুন করে আলোকিত হই। রোজারিমালার প্রতিটি রহস্য আমাদের যিশুর জীবনের এক একটি ধাপের দিকে নিয়ে যায়– তাঁর জন্ম, মৃত্যু, পুনরুত্থান– যা আমাদের জীবনের দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-উল্লাস ও আশা-নিরাশার সঙ্গে গভীরভাবে মিলে যায়। এই ধ্যান এবং জপের মাধ্যমে একজন বিশ্বাসী নিজের জীবনকেই যিশুর জীবনের ছায়ায় ফেলে দেখতে পারেন। ফলে রোজারিমালা হয়ে ওঠে এক জীবন্ত আধ্যাত্মিক যাত্রা।

বর্তমান সময়, যেখানে আমরা প্রযুক্তির জালে আবদ্ধ, মানসিক চাপ ও অস্তিত্বের সংকটে ভুগি - সেখানে রোজারিমালা এক নিরব কিন্তু গভীর প্রতিরোধ। প্রতিদিনের কয়েক মিনিট সময় নিয়ে যদি আমরা রোজারিমালা হাতে নিয়ে প্রার্থনা করি, তবে তার প্রতিফলন আমাদের মন ও মননে পড়বেই। শান্তি, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাস– এই গুণগুলোর পুনর্জাগরণ হয় এই প্রার্থনার মাধ্যমে। বাস্তবতাও বলছে– রোজারিমালার মাধ্যমে বহু মানুষ মানসিক স্বস্তি পেয়েছেন, ভয় ও দুর্যোগে শান্তি খুঁজে পেয়েছেন, এমনকি তাদের জীবনে অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে বলেও অনেকেই সাক্ষ্য দিয়েছেন। তবে অলৌকিকতার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ এর নিয়মিত চর্চা, যা ধীরে ধীরে চরিত্র গঠনে ও আত্মিক উন্নতিতে সাহায্য করে।

বিশ্বজুড়ে অনেক খ্রিস্টান অক্টোবরে প্রতিদিন রোজারিমালা প্রার্থনার মাধ্যমে নিজ পরিবার, সমাজ এবং বিশ্বশান্তির জন্য প্রার্থনা করেন। বিশেষত ৭ অক্টোবর, পবিত্র জপমালার রাণী মা মারীয়ার পর্ব দিবস পালনের মাধ্যমে আমরা স্মরণ করি সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তকে, যখন বিশ্বাসীরা রোজারিমালার শক্তিতে এক ভয়াবহ যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েও বিজয় অর্জন করেছিল। সেই ঐতিহাসিক বাস্তবতা আজও আমাদের মনে করিয়ে দেয়– রোজারিমালার শক্তি কেবল আধ্যাত্মিক নয়, বাস্তব ও প্রভাবশালী।

আজকের বিশ্বের অস্থিরতা, যুদ্ধ, অনিশ্চয়তা ও মানসিক ক্লান্তির মাঝে রোজারিমালা এক নিরব আশ্রয়। প্রার্থনার প্রতিটি জপ যেন আমাদের হৃদয়ে স্থাপন করে শান্তি, ক্ষমা ও দয়ার বীজ। এ প্রার্থনা পরিবারে একতা আনে, সমাজে আলো ছড়ায় এবং ব্যক্তিগত জীবনে আত্মিক দৃঢ়তা দান করে।

এই অক্টোবর মাসসহ সবসময়ই যেন রোজারিমালা হাতে রাখি। প্রতিদিন কয়েক মিনিট হলেও যদি আমরা এই প্রার্থনায় মনোনিবেশ করি, তবে তা আমাদের জীবনকে পাল্টে দিতে পারে। প্রয়াত পুণ্যপিতা সাধু ২য় জন পল বলেছিলেন, "The Rosary is my favorite prayer." তাঁর মতো আমাদেরও উচিত এই প্রার্থনাকে নিজের প্রিয় অনুশীলন করে তোলা এবং সেই অনুশীলনে বিশ্বস্ত থাকা। কলকাতার সাধ্বী তেরেজা বলেন, "মায়ের জপমালা হল আমার নিত্যসঙ্গী"। এ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তিনি যিশুর সান্নিধ্যে যান এবং তাঁর শক্তি লাভ করেন অসাধ্য সাধনের। আমরাও নিয়মিতভাবে ব্যক্তি, পরিবার ও দলগতভাবে রোজারিমালা প্রার্থনা করলে শান্তিতে থাকতে পারবো তা নিশ্চিত। তাই রোজারিমালা প্রার্থনা আমাদের নিত্য সঙ্গী হয়ে ওঠুক। †

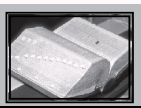

দশজনেই কি শুচীকৃত হয়নি? তবে অপর ন'জন কোথায়? (লুক ১৭:১৭)

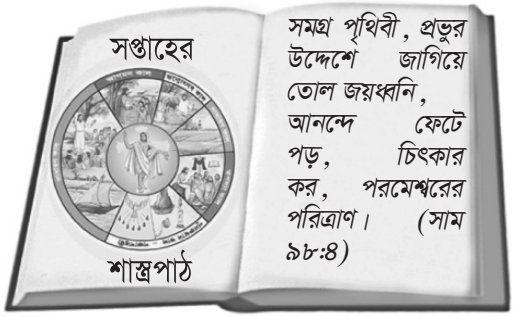

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১২ অক্টোবর - ১৮ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

১২ অক্টোবর, রবিবার
সাধারণকালের ২৮শ রবিবার *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
২ রাজা ৮: ১৪-১৭, সাম ৯৮: ১-৪, ২ তিম ২: ৮-১৩, লুক ১৭: ১১-১৯
১৩ অক্টোবর, সোমবার
সাধারণকালের ২৮ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
রোম ১: ১-৭, সাম ৯৮: ১-৪, লুক ১১: ২৯-৩২
১৪ অক্টোবর, মঙ্গলবার
সাধারণকালের ২৮ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
সাধু প্রথম কালিস্তুস, পোপ ও ধর্মশহীদ
রোম ১: ১৬-২৫, সাম ১৯: ১-৫, লুক ১১: ৩৭-৪১
১৫ অক্টোবর, বুধবার
সাধারণকালের ২৮ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
অভিলার সাধ্বী তেরেজা, কুমারী ও আচার্য, স্মরণদিবস
রোম ২: ১-১১, সাম ৬২: ২-৩, ৬-৭, ৯, লুক ১১: ৪২-৪৬
১৬ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
সাধারণকালের ২৮ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
সাধু হেডভিগ, সন্ন্যাসব্রতী, সাধ্বী মার্গারেট মেরী আলাকুক, কুমারী
রোম ৩: ২১-৩০ক, সাম ১৩০: ১-৬, লুক ১১ ৪৭-৫৪
১৭ অক্টোবর, শুক্রবার
সাধারণকালের ২৮ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
আন্তিয়োখের সাধু ইগ্নেশিউস, বিশপ ও ধর্মশহীদ, স্মরণ দিবস
রোম ৪: ১-৮, সাম ৩২: ১-২, ৫, ১১, লুক ১২: ১-৭
১৮ অক্টোবর, শনিবার
সাধু লুক, সুসমাচার রচয়িতা, পর্ব
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
২ তিম ৪: ১০-১৭, সাম ১৪৫: ১০-১৩, ১৭-১৮, লুক ১০: ১-৯

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১২ অক্টোবর, রবিবার
+ ১৯৯৮ ফা. আলবিনো মিক্লাউচিস্ এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০৯ মাদার লুইজা পেন্নাতি, এসসি (ঢাকা)
১৩ অক্টোবর, সোমবার
+ ২০১৪ সি. ফ্রান্সিসকা রোজারিও, এসসি (ঢাকা)
+ ২০১৭ ফা. রেঞ্জামিন কস্তা, সিএসসি (ঢাকা)
১৪ অক্টোবর, মঙ্গলবার
+ ১৯৭৪ মন্সিনিয়র ইসিদোর দ্যা কস্তা, (ঢাকা)
+ ১৯৭৪ ফা. ভালেরিয়ানো কব্বে, এসএক্স (খুলনা)
১৫ অক্টোবর, বুধবার
+ ১৯৪৫ সি. জেভিয়ার, এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
১৬ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৬২ সি. এম. ইউজিন গ্রেনিয়ার, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৯ মাদার আল্ফন্স লাটোর, এলইচসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৮ ব্রা. রনাল্ড এফ. ড্রাহজাল, সিএসসি (ঢাকা)
১৭ অক্টোবর, শুক্রবার
+ ১৯৯১ সি. মেরী ফ্রান্সিস, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১০ ফা. ব্রুনো আলদো লিয়ার্নিয়েরো, এসএক্স (খুলনা)
১৮ অক্টোবর, শনিবার
+ ১৯৯৯ ফা. ফ্রান্সিস তোমাজেল্লী, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০৭ ফা. সান্দ্রো জাকোমেল্লী, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০২৩ ফা. হারুন হেম্ব্রম (রাজশাহী)

ঈশ্বরের পরিত্রাণ: বিধান ও অনুগ্রহ

সারসংক্ষেপ

২০৪৭ নৈতিক জীবন হচ্ছে আধ্যাত্মিক উপাসনা। খ্রীষ্টীয় কাজকর্মের পুষ্ট সাধন হয় উপাসনা-অনুষ্ঠান ও ধর্মসংস্কারীয় অনুষ্ঠানে।

২০৪৮ খ্রীষ্টমণ্ডলীর আজ্ঞাসমূহের বিশেষ ভূমিকা হচ্ছে নৈতিক ও খ্রীষ্টীয় জীবনকে উপাসনা-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত রাখা এবং তা থেকে পুষ্টি লাভ করা।

২০৪৯ খ্রীষ্টমণ্ডলীর পালকগণের শিক্ষাদানের ক্ষমতা সাধারণতঃ ধর্মশিক্ষা ও বাণীপ্রচারের মধ্য দিয়ে অনুশীলন করা হয়, যার ভিত্তিরূপে রয়েছে ঈশ্বরের দশ-আজ্ঞা, যা সব মানুষের নৈতিক জীবনের জন্য বৈধ মূলনীতি হিসেবে তুলে ধরে।

২০৫০ প্রকৃত শিক্ষাদানকারী হিসেবে রোমের যাজক-প্রধান ও মণ্ডলীর বিশপগণ ঐশ জনমণ্ডলীর কাছে সেই বিশ্বাস প্রচার করেন যা তাদেরকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে ও নৈতিক জীবনে যা সাধনা করতে হবে। এছাড়া, যেসব নৈতিক বিষয় প্রাকৃতিক বিধান ও মানুষের বিচারবুদ্ধির আওতায় পড়ে সেগুলোর পক্ষে ঘোষণা দেওয়ার দায়িত্বভারও তাদের হাতে ন্যস্ত।

২০৫১ খ্রীষ্টমণ্ডলীর শিক্ষাদানকারী পালকদের ক্ষমতা নৈতিক শিক্ষাসহ ধর্মতাত্ত্বিক সকল বিষয়ের মধ্যে বিস্তৃত, কেননা এর ব্যতিরেকে বিশ্বাসের পরিত্রাণদায়ী সত্য সংরক্ষণ, ব্যাখ্যা ও পালন করা যায় না।

বড়দিন সংখ্যা ২০২৫ এর জন্য লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে খ্রিস্টীয় শুভেচ্ছা নিবেন। এ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর "বড়দিন সংখ্যা ২০২৫" নতুন আঙ্গিকে ও নতুন পরিসরে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। তাই বড়দিন সংখ্যা ২০২৫ এর জন্য আপনার সুচিন্তিত লেখা (প্রবন্ধ ও নিবন্ধ, গল্প, স্মৃতিকথা, স্বাস্থ্য সমাচার, কবিতা ও কলাম) বিভাগ উল্লেখপূর্বক (খোলা জানালা, সাহিত্য মঞ্জুরী, যুব তরঙ্গ, মহিলাঙ্গণ) পাঠিয়ে দিন আগামী ২০ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী

১. যে কোন লেখায় উদ্ধৃতি বা কোন তথ্য সহায়তা নিলে তার জন্য অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া তথ্যসূত্রও জানাতে হবে। এ ব্যাপারে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।
২. আপনাদের লেখা পূর্বে কোথাও ছাপানো হয়ে থাকলে, তা জানাতে হবে অর্থাৎ কোথায়, কখন ছাপানো হয়েছে, তা উল্লেখ করতে হবে। অথবা 'সৌজন্যে' লিখতে হবে।
৩. লেখা কম্পোজ করে, Sutonny MJ ফন্টে এবং MS Word 97-2003 Document-এ পাঠাতে হবে। হাতের লেখা গ্রহণ করা হয়, তবে তা কাগজের এক পৃষ্ঠায়, স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
৪. মণ্ডলীর শিক্ষার পরিপন্থী, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরাসরি, কিংবা নাম উল্লেখ করে কোন লেখা, তা ছাড়া মানবিক মর্যাদা, অধিকার ও মূল্যবোধ ক্ষুন্ন হয় এমন লেখা পরিহার যোগ্য।
৫. লেখা মান সম্মত হলেই কেবল ছাপানো হয়।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার,ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

খ্রিস্ট-জুবিলী: আশার তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণ

বিশপ জের্ভাস রোজারিও

পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে গত বছর আগমনকালের আরম্ভে আমরা শুরু করেছি খ্রিস্ট জয়ন্তী বর্ষ; অর্থাৎ খ্রিস্টজন্মের ২০২৫ বছর উদ্‌যাপন করার জন্য আমরা নানা আয়োজন করেছি। এই খ্রিস্ট জয়ন্তী বা জুবিলী পালনের জন্য পোপ ফ্রান্সিস আমাদের মূলভাব বেধে দিয়েছেন, "আশার তীর্থযাত্রী" অর্থাৎ "আমরা আশার তীর্থযাত্রী"। এই জগতে আমাদের অনেক আশা আছে; আর আশাই আমাদের সামনে এগিয়ে চলতে প্রেরণা দেয়, শক্তি জোগায় ও পথ দেখায়। কিন্তু আমরা জানি এই জগতের সকল আশা পূর্ণ হয় না। তবু আমরা আশা করি- আশায় বুক বাঁধি। আশা করি যে, আমরা একদিন এই জগতের সকল অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট, হতাশা-নিরাশা, বাধা-বিপত্তি, ব্যর্থতা-পরাজয়, ব্যথা-বেদনা সবই জয় করতে পারব।

আমাদের জীবন একদিন ভরে উঠবে নিরবচ্ছিন্ন সুখ আর আনন্দে। আমরা পাব বিজয়ের আনন্দ ও তৃপ্তি। আমরা আশা করি, কিন্তু এটাও জানি যে আমাদের আশাগুলো পূর্ণ হবে কি না সেই বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। আমাদের কিছু আশা পূর্ণ হলেও অনেক আশাই পূর্ণ হয় না, তা পূর্ণ হওয়ার কোন সম্ভাবনাও থাকে না, সে যত চেষ্টাই করি না কেন! জগতের আশাগুলো সব পূর্ণ না হলেও আমাদের একটা আশা যেন অবশ্যই পূর্ণ হয় আমরা তা চাই। সেই আশা করি, কারণ আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে, আমরা বিশ্বাস করি যিশুখ্রিস্টকে আর আমরা বিশ্বাস করি পবিত্র আত্মাকেও। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা অর্থাৎ পবিত্র ত্রিত্বের নামে দীক্ষিত হয়েছি এই আশায় যে, আমরা একদিন আনন্দলোকে, সেই স্বর্গলোকে, অনন্ত সুখের সেই অমরাবতীতে প্রবেশ করতে পারব।

জগতের সকল আশা ব্যর্থ হয়ে যাক, তবু আমরা সকলেই কিন্তু চাই বা আশা করি যেন আমাদের এই শেষ আশা, সেই চূড়ান্ত আশা পূর্ণতা পায়। আমরা যারা খ্রিস্টবিশ্বাসী, আমরা এই বিশ্বাসেই ধর্ম পালন করি যে, একদিন এই জীবনের শেষে আমরা ঈশ্বরের কাছে যাব, স্বর্গে যাব। আর তা না হলে অযথাই এই ধর্মপালন। স্বর্গে যাওয়ার আশা করলেই হবে না, তা অর্জন করার যোগ্যতাও আমাদের অর্জন করতে হবে। এটাই আমাদের আশার তীর্থযাত্রা। কিন্তু কথা হলো, এই আশার তীর্থযাত্রা আমরা কিভাবে পূর্ণ করব? এর জন্য আমাদের ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করে প্রার্থনা ও উপাসনায় তাঁকে ডাকতে হবে। ধ্যান-সাধনা, ত্যাগস্বীকার ও দয়ার কাজ করতে হবে; যারা অবহেলিত তাদের প্রতি সদয় হয়ে সাহায্য করতে হবে।

সহযোগিতা ও সহভাগিতার মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ব ও মিলনের সমাজ গড়ে তুলতে হবে, এই সব কিছুই আমাদের জানা আছে! কিন্তু আমরা এর কতটুকু পালন করি? এইসব জানা আর সেগুলো পালন করার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। স্বর্গের তীর্থযাত্রী হতে হলে এইসব বিষয় শুধু জানলেই চলবে না, তা পালনও করতে হবে। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের পালকীয় পত্রে আমি লিখেছি, "আশার তীর্থযাত্রী হিসাবে আমাদের কিছু করণীয়ও রয়েছে। খ্রিস্ট জয়ন্তীর বছরটি আমাদের আহ্বান জানায় প্রার্থনা ও উপাসনায় অংশগ্রহণ করতে। যিশুরই নির্দেশ "তোমরা জেগে থাকো আর প্রার্থনা করো যেন প্রলোভনে না পড়" *(মার্ক ১৪:৩৮)*। পোপ ফ্রান্সিস আমাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যেন আমরা প্রার্থনা করি আর "আশার বহ্নিশিখায় বাতাস দিয়ে আরও উত্তপ্ত করে জ্বালিয়ে রাখি" যেন তা নিভে না যায় *(জুবিলী বর্ষ ঘোষণাপত্র)*।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে যুদ্ধ-বিগ্রহ, জাতিগত দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, স্বার্থপরতা ও বৈরিতা চলছে এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, অরাজকতা ও অশান্তির আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে তা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতকে করে তুলছে অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমাদের দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতা আমাদের প্রতিনিয়ত শঙ্কিত করে তুলছে। আমরা এইসব পাপের পথ ও নিগ্রহ থেকে মুক্তি চাই; আমরা মানব সভ্যতার উন্নয়ন ও প্রেমের কৃষ্টি-সংস্কৃতি চাই, আমরা শান্তিতে থাকতে চাই। আমরা এই আশা করি যে, সকল মানুষের মধ্যে সুমতি এবং সকল দেশ ও সমাজে শান্তি আসবে। এর একমাত্র নিশ্চয়তা হলো যিশুর আশ্বাস-বাণী "আমি তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি; আমারই শান্তি তোমাদের দান করছি" *(যোহন ১৪:২৭)*। আমরা যিশুর সেই শান্তিই চাই। কারণ যিশুখ্রিস্টই আমাদের আশা- তিনিই আমাদের সকল আশার পূর্ণতা।

মণ্ডলীতে অংশগ্রহণের জন্য আসুন আমরা যিশুর শিক্ষানুসারে জীবন যাপন করি। শুধু তাই নয়, আসুন আমরা যিশুর 'জীবন্ত দেহ' মণ্ডলী হয়ে উঠি। আমরা শুধু খ্রিস্টমণ্ডলীর সদস্যই নই, বরং আমরাই খ্রিস্টমণ্ডলী, কারণ আমরা যিশুর জীবন্ত দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। যদি তাই হয়, তাহলে আমাদের এই খ্রিস্টমণ্ডলীর সেবাকাজে আত্মনিয়োগ করা উচিত। এই সেবা কাজের মধ্যে রয়েছে- বাণীপ্রচারের কাজ কারণ মণ্ডলীর স্বভাবই হলো বাণী প্রচার করা। আমরা সেই কাজ করতে পারি আমাদের পরিবার, সমাজ ও ধর্মপল্লীতে আমাদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ, জীবনাদর্শ, ন্যায্যতা ও শান্তির মানুষ হয়ে। আমাদের দেশে এখনো অনেক মানুষ রয়েছে যারা যিশুর বাণী শুনতে চায়, তাদের কাছেও বাণীপ্রচার করতে হবে। যাদের পক্ষে সম্ভব তাদের এই বাণীপ্রচারের কাজে এগিয়ে আসা উচিত।

খ্রিস্ট জন্মজয়ন্তী বর্ষের পূর্ব থেকেই পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা সিনোডাল বা মিলনধর্মী ও অংশগ্রহণকারী মণ্ডলী হওয়ার চেষ্টা করে আসছি। বর্তমান পোপ চতুর্দশ লিও আমাদের সেই একই আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু আমরা মূল্যায়ন করে দেখি এই জুবিলী বা খ্রিস্টজয়ন্তী পালন করার প্রাক্কালে জুবিলী বর্ষের করণীয় দিকগুলোর কতটুকু অর্জন করতে পেরেছি? স্থানীয় ধর্মপল্লী ও ধর্মপ্রদেশে আমরা কতটুকু অংশগ্রহণকারী মণ্ডলী হতে পেরেছি? খ্রিস্টযাগ, সাক্রামেন্ত বা ধর্মসংস্কারগুলোতে, ধর্মপল্লী ও ধর্মপ্রদেশে আমাদের অংশগ্রহণ কতটা বেড়েছে?

আমাদের ধর্মপল্লীর খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠান ও সেবাকাজগুলো কি এখনো যাজকদের "ওয়ান ম্যান সো" রয়ে যায়নি? আমাদের মণ্ডলী যে সত্যিকারের "সিনোডাল মণ্ডলী" তার প্রথম প্রমাণ হতে হবে পবিত্র খ্রিস্টযাগ; যেখানে "অ্যাকোলাইট" বা বেদীসেবক, "লেক্টর" বা বাণীপাঠক, "কমুনিয়ন মিনিস্টার" বা খ্রিস্টপ্রসাদ বিতরণকারী হিসাবে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের অংশগ্রহণ থাকবে। কিন্তু আমাদের ধর্মপ্রদেশের অনেক ধর্মপল্লীতেই এখনো পর্যন্ত এই দায়িত্বগুলোতে খ্রিস্টভক্তদের প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। এর কারণ যাজকদের অবহেলা ও খ্রিস্টভক্তদের উদাসীনতা বা অনীহা। এই অবস্থা চলতে থাকলে আমরা কখনোই "সিনোডাল মণ্ডলী" গঠন করতে পারব না।

এই খ্রিস্টজয়ন্তী বর্ষে আমাদের মনের পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। পাপের পথ থেকে আমাদের মন পরিবর্তন করতে হবে। অপরকে ক্ষমা দিয়ে ও অন্যের কাছ থেকে ক্ষমা লাভ করে আমরা যেন আবার আমাদের মধ্যে পুরনো সদ্‌ভাব ফিরিয়ে আনতে পারি। এইভাবে আমরা একটা সুন্দর সমাজ ও স্থানীয় মণ্ডলী গড়ে তুলতে পারি। তাছাড়া স্থানীয় ধর্মপল্লী পরিচালনায় আমরা অংশগ্রহণ করতে পারি আমাদের পরামর্শ ও কায়িক শ্রম দিয়ে; প্রেম ও দয়ার কাজের মাধ্যমে দুস্থ্যদের সাহায্য করে ও মণ্ডলীর সকল প্রকার ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ দান করে।

মণ্ডলী কর্তৃক প্রদত্ত ষষ্ঠ আজ্ঞার পঞ্চম

(বাকি অংশ ৮ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

মা মারীয়ার সাথে জীবনের পথে

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

মানব মুক্তির ইতিহাস, জগতে যিশুর জন্ম ও বেড়ে ওঠা *(দ্রঃ লুক ১:২৬-৩৮; ২:১-২১;৪১-৫২)* এবং তাঁর জীবনের সঙ্গে মারীয়ার পথ চলা আমাদেরকে বাণী নির্ভর জীবন যাপনে অনুপ্রাণিত করে। আশা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যোগায়। কুমারী মারীয়া যিশুর মা, কুমারী মারীয়া মণ্ডলীর মা, মারীয়া আমার/আমাদের মা। মানব মুক্তির যাত্রাপথে যিশু ও মারীয়ার সাক্ষাৎ এবং ক্রুশের নিচে দাঁড়িয়ে যিশুর ক্রুশ মৃত্যুর সাক্ষী হওয়া, জগতের কাছে নিজের মাকে দেওয়া *(দ্রঃ যোহন ১৯:২৫-২৭)*, ভয়ে দিশেহারা হতাশ শিষ্যদের সঙ্গে থেকে প্রার্থনা করে *(দ্রঃ শিষ্যচরিত ১:১৪)* তাদের সান্ত্বনা যুগিয়েছেন। পঞ্চাশত্তমীর পর্ব দিবসে পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করেছেন। মারীয়ার এই সহযাত্রিক যাত্রা ও জীবন ধারা মারীয়াকে যিশু, মণ্ডলী ও আমাদের মা করে তুলেছে। মা মারীয়া, আমাদের শিক্ষা দেয়, আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাণীকে পাথেয় করে জীবনের পথে এগিয়ে যেতে পারি।

মারীয়ার সাথে জীবনের পথেঃ মা মারীয়া ঈশ্বরের মনোনীত যিশুর মা, যিনি সর্বদাই ঈশ্বরের বাণী অনুসারে জীবন যাপন করেছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছাকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন ও যিশুর প্রচার কাজের সঙ্গী হয়েছেন। তিনি যিশুর ও মণ্ডলীর মা হিসাবে সর্বদাই আমাদের সঙ্গে থাকেন ও জীবন পথে চলতে প্রেরণা যোগান। মারীয়া ঈশ্বর জননী হয়েছেন, কারণ ঈশ্বর তাকে তাঁর পুত্র যিশু খ্রিস্ট, রাজাধিরাজের জননী হওয়ার জন্য মনোনীত করেছেন। তিনি প্রসাদে পূর্ণা। যার গর্ভে জগতের মুক্তিদাতা জন্মেছেন *(দ্রঃ লুক ১:২৬-৩৮);* যার মধ্য দিয়ে আমরা লাভ করেছি অনুগ্রহ আর অনুগ্রহ *(যোহন ১:১৬খ)*। ঈশ্বর যাকে তাঁর পুত্রের জননী করেছেন, তাকে মানুষ ভক্তি ও সম্মান না করে কি থাকতে পারে? ঈশ্বর যিশুকে এই জগতে মারীয়ার মধ্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন। যিশু জগতে প্রেরিত মুক্তিদাতা, যিনি মারীয়ার পরিবারে থেকে জ্ঞানে ও বয়সে বেড়ে উঠেছেন *(দ্রঃ লুক:২:৫১-৫২)*। যিশু, তাঁর জীবনের চরম যন্ত্রণা ও পূর্ণতার সময়ে ক্রুশে থেকে মারীয়াকে আমাদের মা হিসাবে দিয়েছেন *(দ্রঃ যোহন ১৯:২৫-২৭)*। মানব মুক্তিদাতার জন্ম ও তাঁর (যিশু) সঙ্গী (মারীয়া) আমাদের জীবনের সাথে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ক) ঈশ্বরের বাণীতে বিশ্বস্ত মারীয়াঃ মারীয়া ঈশ্বরের বাণীকে নিজের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। জগৎ ও সমাজের নিয়মের বাহিরে এসে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে মেনে নিয়েছেন *(দ্রঃ লুক ১:৩৪;৩৮)* ও ঈশ্বরপুত্র যিশুকে জগতে জন্ম দিয়েছেন *(দ্রঃ লুক ২:১-৭)*। মারীয়ার বাণী নির্ভর জীবন বিশ্বাসী ভক্তজনগণকে অনুপ্রাণিত করে বাণী নির্ভর জীবন যাপন করে প্রেরিত হতে। তিনি যিশুর বিষয়ে উচ্চারিত ভবিষ্যদ্বাণী সকল কথা মনের মধ্যে গেঁথে রাখতেন *(দ্রঃ ২:২৮-৩৮)*। ঈশ্বরের ইচ্ছাকে মেনে নিয়ে যিশুর মা হওয়াতে মারীয়াকে অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, এমনকি অভিবাসীর জীবন যাপন করতে হয়েছে *(দ্রঃ মথি ২:১৩-২৩)*, তবুও তিনি কখনই ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, বরং বিশ্বাসে এগিয়ে চলেছেন। মারীয়া, আমাদের প্রেরণা ও ভরসা যোগান কিভাবে ঈশ্বরের বাণীতে বিশ্বস্ত হয়ে জীবন যাপন করতে হয়।

খ) প্রেরণকর্মীদের আদর্শ মা মারীয়াঃ মা মারীয়া দূতের কথায় হ্যাঁ বলার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের প্রেরণ কাজকে জগতে মূর্ত করে তুলেছেন। তিনি গ্রহণ করেছেন সুসংবাদ; সেইসাথে শুনেছেন আরও একটি সুসংবাদ। তাঁর জ্ঞাতি বোন এলিজাবেথ বৃদ্ধা বয়সে মা হতে চলেছেন। মারীয়া তাকে সেবা করার জন্য বেরিয়ে পড়েন এবং তার সাথে ৩ মাস অবস্থান করেন *(দ্রঃ লুক ১:৩৮-৪১;৫৬)*। এইভাবে মারীয়ার নম্রতা, উদারতা ও অপরকে সাহায্য করার উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত ফুটে উঠে। মারীয়ার অনুরোধেই যিশু সময়ের আগেই অলৌকিক কর্ম সম্পন্ন করে পরিবারকে লজ্জার হাত থেকে উদ্ধার করেন *(দ্রঃ যোহন ২:১-১১)*। প্রেরণকর্মীর প্রতিটি প্রেরণকর্মের জীবন ও সক্রিয়তা মারীয়ার কাছ থেকেই তাগিদ অনুভব করে। অন্যের প্রয়োজনে তাদের পাশে সহায়ক হয়ে দাঁড়াতে মারীয়াই আমাদের প্রেরণা দেয় ও সাহস যোগায়। ঈশ্বর মারীয়ার মধ্য দিয়ে অবিরত কৃপা ও অনুগ্রহ দান করেন। মারীয়া জগতে অনুগ্রহ নিয়ে এসেছেন। এই অনুগ্রহ মানুষের পরিত্রাণ স্বয়ং খ্রিস্ট যিশু। যিশু জগতে এসেছেন কুমারী মারীয়া মধ্য দিয়ে; "ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারীগর্ভে জন্ম নিলেন *(গালাতীয় ৪:৪)*। মণ্ডলীর জন্মলগ্ন থেকে মারীয়া প্রেরিত শিষ্যগণ ও সকল প্রেরণকর্মী প্রেরণকাজে প্রেরণার উৎস হয়ে আসছেন। আজও আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষণে মারীয়ার শরণাপন্ন হই।

গ) বিশ্বাস ও নম্রতার আদর্শ মারীয়াঃ মারীয়া মণ্ডলীর মা, তিনি ঈশ্বর জননী। বিশ্বাসীদের জীবনে তিনি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আসনে বিরাজমান। স্বর্গদূতের সংবাদ পেয়ে মারীয়া নিজেকে প্রভুর দাসী হিসেবে নিবেদন করেন ও বাণীতে বিশ্বাস করেন *(দ্রঃ লুক ২:২৬-৩৮)*। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে অবিচল ও নম্রতায় আত্মনিবেদন করেই এগিয়ে চলেছেন জগতের সহ-মুক্তিদায়ী হিসাবে। "যে কেউ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সে-ই আমার ভাই ও বোন ও মা" *(মথি ১২:৫০)*। মারীয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে চির বিশ্বস্ত। মারীয়ার বিশ্বাসে দৃঢ়তার সত্যতা প্রকাশিত হয় যিশুর ক্রুশ-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। তিনি যিশুর ক্রুশের তলার দাঁড়িয়ে ছিলেন *(দ্রঃ ১৯:২৫)*। মানব মুক্তির জন্য ক্রুশে যিশুর প্রাণত্যাগ নিজ চোখে দেখেন ও মানব মুক্তির পরিকল্পনায় পূর্ণ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। নিজ পুত্রের যন্ত্রণাময় মৃত্যু দেখেও নিরবে ধ্যানমগ্ন হয়েছেন। ক্রুশের তলায় মারীয়ার নিরব উপস্থিতি বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও নম্রতার আদর্শ প্রতীয়মান। বিশ্বাসীদের জীবনে মা মারীয়াই বিশ্বাস ও নম্রতার আদর্শ এবং যিশুর পানে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা।

ঘ) প্রার্থনারত সান্ত্বনাদাতা মারীয়াঃ যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর মারীয়া সব সময় শিষ্যদের সাথে থেকে তাদের সান্ত্বনা দিয়েছেন ও প্রার্থনারত ছিলেন *(দ্রঃ শিষ্যচরিত ১:১৪)*। শিষ্যগণ নিরাশ হয়ে তাদের পুরানো পেশায় ফিরে যাচ্ছিল *(দ্রঃ যোহন ২১:৩)*, কেউ আবার হতাশ হয়ে জেরুসালেম ছেড়ে যাচ্ছে *(দ্রঃ লুক ২৪:১৩-২৩)*। যিশু শিষ্যদের দেখা দিলেও তারা প্রকৃত পক্ষে বিশ্বাস করতে পারে না, মনে সন্দেহ থেকে যায় *(দ্রঃ লুক ২৪:৩৬-৪২)*। যিশু স্বর্গে উন্নীত হওয়ার পর জেরুসালেমে ফিরলে মারীয়া শিষ্যদের একত্রিত করে, প্রার্থনায় জীবন যাপন করতে তাগিদ দিয়েছেন *(দ্রঃ শিষ্যচরিত ১:১২-১৪)*। শিষ্যদের সাথে মারীয়াও আশা ও প্রার্থনায় পবিত্র আত্মার প্রতীক্ষায় ছিলেন ও পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করেন। মা মারীয়া আমাদের জীবন পথে হতাশা-নিরাশা, ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-কষ্টের মাঝে নিত্য আশা ও সান্ত্বনা যোগান। আমাদের হয়ে তার পুত্রের কাছে অনুনয় করেন।

'জগৎ ত্রাতার মাতা তুমি মা মারীয়া, ডাকি তোমায় আপন মনে জীবন ভরিয়া'। মারীয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি নিজেকে প্রভুর দাসী হিসেবে সম্মতি প্রদান করে যে কার্য শুরু করেছেন তা থেকে কখনোই পিছুপা হননি। তিনি যা বিশ্বাস করেছেন, তা নিজ জীবনে পালন করে দেখিয়েছেন কিভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছাকে নিজ জীবনে গ্রহণ করে নম্র হয়েছেন এমনকি জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন। মা মারীয়াকে অনুসরণ করে জগতে আনন্দিত মনে মঙ্গলবাণীর আলোকে জীবন যাপনই জীবনের পূর্ণতা। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও মাণ্ডলিক জীবনে মা মারীয়র অবস্থান ও ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের পথে মা মারীয়া আমাদের আশা ও প্রেরণা।

জপমালা প্রার্থনা: মা মারীয়ার সহযোগে আমরা আশার তীর্থযাত্রী

ডানিয়েল লর্ড রোজারিও

"মা" এমনই একটি শব্দ যার মধুরতা মধুর চেয়ে শতগুণ মিষ্টি। আমাদের জাগতিক মায়ের পাশাপাশি রয়েছে স্বর্গীয়া মা, অর্থাৎ মা মারীয়া। আধ্যাত্মিক অর্থে মা মারীয়া আমাদের সকলেরই জননী। জপমালা প্রার্থনায় আমরা মা মারীয়ার একান্ত সান্নিধ্যে আসি। এই মায়ের কাছে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে, মনপ্রাণ ঢেলে কোন আবেদন ও যাচ্না করলে তা বিফল হয় না। আমরা যখন যাই করি না কেন মা মারীয়া হলেন আমাদের রক্ষাকারিণী। আর তাইতো কলকাতার মাদার তেরেজা তার জীবন অভিজ্ঞতার আলোকে বলেছেন, "মায়ের জপমালা হল আমার নিত্যসঙ্গী"। কাথ লিক মণ্ডলী তথা আমাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের যাত্রাপথে মা-মারীয়া সর্বদাই বিদ্যমান সহায়তা দানকারিণী ও কৃপাময়ী মা হিসেবে। মা মারীয়া হলেন পরিবার বা গৃহের রাণী। আমরা যখন মা মারীয়ার আশ্রয়ে বাস করি তখন আমরা আনন্দে ও নিরাপদে থাকি। কারণ আমাদের জাগতিক মা যেমন সর্বদা আমাদের কল্যাণার্থে কাজ করেন তেমনি আমাদের স্বর্গীয়া মা আমাদের সকল মন্দতা,পাপময়তা ও বিপদ থেকে রক্ষা করেন। অন্যদিকে এ বছর আমরা পালন করছি যিশুখ্রিস্টের জন্মের ২০২৫ বছরের জুবিলী উৎসব। আমরা সবাই আশার তীর্থযাত্রী, বহুমুখী উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা যাত্রা করছি। আমাদের যাত্রাপথে মা মারীয়া আমাদের সাথে সহযাত্রী হিসেবে যাত্রা করেন যেমনটি তার পুত্রের ক্রুশীয় মৃত্যুর সময় করেছেন। সেই স্বর্গীয়া মাকে পূর্ণাঙ্গভাবে জানা এবং তাকে যথাযথ সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

মারীয়ার পরিচয়: মারীয়া শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো 'রাজকন্যা', 'শ্রদ্ধেয়া' ও 'সুন্দরী'। হিব্রু ভাষায় 'মিরিয়াম' ইংরেজি 'মেরী' এবং লাতিন ও ইতালিয়ান ভাষায় ' মারীয়া'। মারীয়ার জন্ম বিষয়ে জানা যায় যে তিনি যোয়াকিম ও আন্নার কন্যা ছিলেন। মণ্ডলীর প্রথা এবং শিক্ষায় বলা হয় যে ঈশ্বর তাকে 'জন্মগত মৌলিক পাপ বা আদি পাপ ছাড়া সৃষ্টি করেছিলেন।' এছাড়া মারীয়া ছোট থেকেই 'কুমারী' থাকার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন ঈশ্বরের সেবায় আত্মসমর্পণ করবেন বলে। সেই যুগেও কুমারী থেকে ঐশসেবা করার রীতি ছিল। তিনি শৈশব থেকেই শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও ধ্যান প্রার্থনায় নিরত থেকে সময় কাটাতেন। তিনি ইহুদি ও সামসংগীত'সহ অনেক কিছুই মুখস্থ জানতেন এবং জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট থ াকতেন। তাঁর পবিত্র জীবনযাপনের কারণেই স্বর্গদূত বলেছিলেন, "প্রণাম তোমায়, পরম আশিস ধন্যা তুমি! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন" *(লুক ১:২৮)*। মারীয়ার জ্ঞাতিবোন এলিজাবেথ অর্থাৎ দীক্ষাগুরু যোহনের মাতার বিষয়ে সাধু লুকের বর্ণনায় বলা হয় "দেখ, তোমার আত্মীয়া এলিজাবেথ, সেও তাঁর বৃদ্ধ বয়সে একটি পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেছে। লোকে যাকে বন্ধ্যা বলে ডাকত তারই এখন ছ'মাস চলছে: কারণ পরমেশ্বরের অসাধ্য কিছুই নেই" *(লুক ১: ৩৬-৩৭)*!

কাথলিক মণ্ডলীতে মারীয়া ও জপমালা প্রার্থনা: গ্রীক শব্দ 'কাথলিক' অর্থ হলো সর্বজনীন আর সর্বজনীন মণ্ডলীর মাতা হলেন মা মারীয়া। কাথলিক মণ্ডলীকে মাতা 'মণ্ডলী' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। মারীয়ার শেষ দিনগুলো কোথায় কিভাবে অতিবাহিত হয়েছে সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়না। তবে এটা সত্য যে, মারীয়া প্রেরিত শিষ্যদের আশ্রয়ে শেষ জীবনযাপন করেছেন। তিনি সম্ভবত এফেসাস বা জেরুসালেম নগরীতে বাস করেছেন। আদি মণ্ডলীর পিতৃগণ বিশেষভাবে জাস্টিন ও ইরেনিয়াস মা মারীয়াকে 'নতুন হবা' বলে অভিহিত করেছেন। মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসের চিহ্ন পাওয়া যায় কাটাকুম্বে অঙ্কিত যিশু ও মারীয়ার চিত্রের মাধ্যমে। মারীয়ার প্রতি ভক্তি, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা আদি মণ্ডলী থেকে চলে আসছে। পঞ্চাশত্তমী দিনে মা মারীয়া শিষ্যদের মাঝে বিদ্যমান ছিলেন এবং তিনি তাদের অভয় বাণী শোনাতেন। মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানিয়ে মহান সম্রাট কন্সটানটাইনের মা হেলেনা (২৫০-৩৩০) মা মারীয়ার জন্মস্থান, যিশুর জন্মস্থানসহ অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করেন তীর্থযাত্রী বেশে। পরবর্তীতে সেই স্থানগুলো তীর্থস্থান হিসেবে বিবেচিত হয় এবং অনেক তীর্থযাত্রী পরিভ্রমণে যেতে থাকে।

'জপমালা' প্রার্থনা হলো দূতের বন্দনা বা প্রণাম মারীয়া প্রার্থনা আবৃত্তি করা। ইংরেজী Rose অর্থাৎ গোলাপ ফুলের সাথে তুলনা করে রোজারী প্রার্থনার উৎপত্তি হয়েছে। মারীয়ার আজন্ম পবিত্রতা বোঝানোর জন্য সাদা গোলাপ বা সাদা গোলাপের কুঁড়ি গেঁথে মালা বানানো হতো। মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসার এই মালাই 'রোজারি' বা জপমালা প্রার্থনায় রূপ লাভ করে। তাই প্রতিটি প্রণাম মারীয়া সাদা গোলাপ তুল্য শুদ্ধ-সুন্দর ও বিশ্বস্ততার চিহ্ন রূপেই পরিগণিত হয়। কাথলিক মণ্ডলীর ইতিহাস ও ঐতিহ্যে পুরুষ-মহিলা, শিশু, যুব, বৃদ্ধ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, গরীব, পণ্ডিত, মূর্খ সকলেই মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে জপমালা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের সকল মহিলা মিলে মা মারীয়ার শিরে সোনার মুকুট পড়িয়ে দেন এবং জগতকে মা মারীয়ার নিকট উৎসর্গ করেন যেন বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

জপমালা প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা ও বর্তমান অবস্থা: জপমালা প্রার্থনা হলো প্রলোভন জয় করার সবচেয়ে বড় শক্তি। অর্থ-বিত্ত বা সম্পত্তি দিয়ে কখনো প্রলোভন জয় করা যায় না। বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণতা বা ক্ষমতা দিয়েও প্রলোভন জয় করা যায় না। প্রার্থনা হলো প্রলোভন জয় করার সবচেয়ে বড় শক্তি, যা আমাদেরকে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে নিয়ে যায় এবং আমাদেরকে প্রলোভন জয় করতে শক্তি দান করে। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, "আমি পণ্ডিত ব্যক্তি হতে চাই না, কিন্তু প্রার্থনার মানুষ হতে চাই।" মহাত্মা গান্ধী ধ্যানী ও প্রার্থনাশীল মানুষ ছিলেন বলেই যিশুর মত জীবনের অনেক প্রলোভন জয় করে সাধু-মানুষ হতে পেরেছিলেন। 'কিশোর রত্ন' সাধু ডমিনিক সাভিও তাঁর জীবন স্বপ্ন দেখেছিলেন এই বলে, "আমি সাধু হতে চাই"। তাঁর পরিবারের প্রার্থনা জীবন থেকেই তিনি এত সুন্দর স্বপ্ন দেখতে পেরেছিলেন। তিনি প্রতিদিন সবার আগে গির্জায় যেতেন। প্রার্থনার শক্তিতে ও ঐশ করুণায় বলীয়ান হয়ে তিনি শপথ করেছিলেন, "আমি মরবো, তবুও পাপ করবো না। পাপ করার চেয়ে মৃত্যু ভালো।"

বর্তমানে পরিবারগুলোতে অনেক সমস্যা বিদ্যমান। এখনকার বাস্তবতা বড়ই দুঃখজনক। অধিক সংখ্যক পরিবারই দৈনন্দিন মালা প্রার্থনা হয় না। বর্তমান সময়ে বিভিন্ন অপসংস্কৃতির কারণে নানাবিধ প্রভাব আমাদের সমাজে ও পরিবারে পড়ছে। একটু লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাব বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও টিভি সিরিয়ালের কারণে সান্ধ্য জপমালা প্রার্থনার সময় আমাদের হয় না। প্রবীণদের কাছে শোনা যায় আগে একবার জপমালা / সন্ধ্যা প্রার্থনা না করলে খাবার দিত না কিন্তু বর্তমান বাস্তবতা ও প্রেক্ষাপট ভিন্ন। বর্তমানে পিতামাতার ধর্মের প্রতি অনীহা, সন্তানদের শাসনের অভাব ও নানাবিধ অপসংস্কৃতির কারণে আমাদের পরিবারগুলোতে জপমালা প্রার্থনা হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে সংসারে অশান্তি, মনোমালিন্য, ঝগড়া-বিবাদসহ নানাধরণের সমস্যা বিরাজমান। এভাবেই পরিবারে ভাঙ্গন আর আমাদের যুবসমাজের অধপতন ঘটে। কিন্তু আমাদের স্বর্গীয়া মা আমাদের জন্য একাকী বসে কান্না করেন যেন আমরা তার কাছে ফিরে যাই।

বর্তমান পৃথিবীতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় জপমালা প্রার্থনার গুরুত্ব: যিশুর মা মারীয়া মানব মুক্তির ইতিহাসে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। মা-মারীয়ার জীবনী আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেন সঠিক

ও নির্ভুল জীবনযাপন করতে। জপমালা প্রার্থনার সাথে একাত্ম হয়ে পোপগণ মারীয়াকে মণ্ডলীতে গুরুত্ব দিয়েছেন। পোপ দশম লিও (১৫১৩-১৫২১) ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসকে 'জপমালার মাস' হিসেবে ঘোষণা দেন। পোপ ত্রয়োদশ লিও জপমালা প্রার্থনা বিষয়ে বলেন, "যে সমস্ত মন্দতা সমাজকে আক্রান্ত করে তা প্রতিহত করার জন্য জপমালা হলো একটি কার্যকর উপায়।" কার্ডিনাল সাধু হেনরী নিউম্যান তার জীবন থেকে বলেন, "জপমালা প্রার্থনার চেয়ে আনন্দদায়ক আর কিছু নেই।" এছাড়াও যারা প্রতিনিয়ত জপমালা প্রার্থনা করে, মা মারীয়া তাদের ১৫টি প্রতিজ্ঞা পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাই ভক্তিভরে ও শ্রদ্ধা সহকারে যতবার আমরা রোজারিমালা আবৃত্তি করি ততবারই মণ্ডলীর সাথে একাত্ম হই এবং ঐশ অনুগ্রহ লাভের প্রীতিভাজন হয়ে উঠি। তাই আমাদের জীবনে মা-মারীয়ার জপমালা প্রার্থনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর মধ্য দিয়েই আমরা পরম পিতার প্রিয় সন্তান হয়ে উঠতে পারি। তাই আসুন, আমরা প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা করি এবং মায়ের স্নেহতলে জীবন কাটাই।

জপমালা প্রার্থনার মাধ্যমে মা মারীয়ার সাথে আশার তীর্থযাত্রা: এ পৃথিবীতে আমরা সকলেই তীর্থযাত্রী। আমরা যদি বাস/রেল স্টেশনের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব সবাই যাত্রা করছে কোন না কোনভাবে কিন্তু সবারই একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে। খ্রিস্টবিশ্বাসের জীবনে আমরাও সকলে তীর্থ করছি আশা নিয়ে। আর বিশ্বাসের যাত্রাপথে সৎকর্ম, সৎপ্রচেষ্টা ও সততাই টিকে থাকার পাথেয় সম্বল হিসেবে। মাতা-মণ্ডলীর ছায়াতলে আমরা সবাই যিশুর সেবক আর মা মারীয়া আমাদের রক্ষাকারী হিসেবে পথযাত্রী। আদি মাতার অবাধ্যতার জন্যে মানুষের পতন এসেছিল আর নবীনা হবা মারীয়ার বাধ্যতার গুণে পরিত্রাণের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। তাই মারীয়া খ্রিস্টমণ্ডলীতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দয়াময়ী ও করুণাময়ী জননী হিসাবে বিদ্যমান। সাধু ইরেনিয়াস বলেন, "মারীয়া তার বাধ্যতার গুণে নিজের এবং সমস্ত মানবজাতির পরিত্রাণের কারণ হয়ে উঠেছেন"। সাধু ব্যক্তিগণ হবার সাথে মা মারীয়াকে তুলনা করে "জীবিতদের মাতা" বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং প্রায়ই স্বীকার করেছেন যে হবার মধ্য দিয়ে এসেছে মৃত্যু আর মারীয়ার মধ্য দিয়ে এসেছে জীবন। সেই জীবনকে ঈশ্বরমুখী ও কল্যাণমুখী করার মাধ্যম হয়েছেন মা মারীয়া। তাঁর বিনম্রতা, বাধ্যতা ও দয়াশীলতা আমাদের হৃদয়-মনকে নিত্য ঘিরে রাখে। মা মারীয়া আমাদের নিত্যদিনের জীবন সাথী হয়ে আমাদের বিশেষ কৃপা আশীর্বাদ লাভে ধন্য করেছেন। ২০২২ খ্রিস্টাব্দে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বিশ্ব যুবদিবসের জন্য মূলসুর হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, 'মারীয়া উঠে সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করলেন'। মা মারীয়া সর্বদা তার সন্তানদের সাথে রক্ষাকারী মা হিসেবে যাত্রা করেন। আর জপমালা প্রার্থনা হলো মা মারীয়ার কৃপা অনুগ্রহ লাভের একমাত্র পথ ও আধ্যাত্মিক অস্ত্র। তাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে আমরা যখন যিশুর জন্মের জুবিলী উৎসব উদ্‌যাপন করছি তখন আমরা ধ্যান করছি আমাদের জীবনগুরু যিশুখ্রিস্টকে নিয়ে। জুবিলী বর্ষের মূলসুরই হলো 'আমরা আশার তীর্থযাত্রী'। আমরা আমাদের মানবীয় জীবনযাপনের জন্য নানাবিধ আশা নিয়ে সেই অনুসারে কার্যসম্পাদনের জন্য চেষ্টা করি। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য এসকল আশা অবশ্যই করা দরকার তবে আমাদের প্রধান ও একমাত্র আশা হলো স্বর্গের দিকে যাত্রা করা। পৃথিবীতে স্বর্গের দিকে যাত্রা একটি লম্বা সময় আর ঠিক সেই আশা পূরণে জপমালা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মা মারীয়া আমার, আপনার, আমাদের সকলের পাশে রক্ষাকারিণী মা হয়ে যাত্রা করেন।

মা মারীয়ার সাথে আমরা যেভাবে আশার তীর্থযাত্রী হতে পারি: ত্রিত্ব পরমেশ্বরের দ্বিতীয় ব্যক্তি দেহধারণ করে মানুষ হলেন একজন কুমারীর গর্ভে। এই কুমারী কন্যাটি হলেন আমাদের জীবনের উজ্জ্বল তারা, আশার আলো ও সবারই প্রিয় মারীয়া। ঈশ্বরের মহাশক্তি ও কৃপার কথা স্মরণ করে তিনি স্বর্গদূতের প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন। মা মারীয়ার সম্মতির মধ্য দিয়েই বহুযুগের প্রত্যাশার অবসান ঘটল ও মানবমুক্তিদাতা পৃথিবীতে এলেন। আর সেই যিশুই আমাদের জীবনে একমাত্র আশা। আমরা ব্যক্তিগত চিন্তায় মায়ের গুণাবলী আমাদের জীবনে চর্চা করার মধ্য দিয়ে যেভাবে আশার তীর্থযাত্রী হতে পারি তা নিম্নে উল্লেখিত:

❖ মারীয়া ছিলেন সহজ, সরল, আদর্শ ও বিনম্র নারী। তিনি বাধ্য, বিনয়ী ও পদাবনতী নারী। তাই আমাদেরও উচিত মা-মারীয়ার ন্যায় সহজ-সরল ও বাধ্যতার জীবন গঠন।

❖ তিনি অনুগতা ও প্রার্থনাশীল নারী। আমাদের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হলো প্রার্থনা। তাই আমাদের প্রতিনিয়ত প্রার্থনার মানুষ হয়ে উঠতে হবে।

❖ মারীয়া ধ্যানময়ী ও ঐশবাণী ধারণকারিণী এবং বাহিকা নারী। আমাদেরও প্রতিনিয়ত ঈশ্বর আহ্বান করেন তার বাণী প্রচার করতে। তাই আমাদের হয়ে উঠতে হবে মঙ্গলবাণীর একনিষ্ঠ প্রচারক।

❖ তিনি অমলোদ্ভবা, নিষ্কলঙ্কা ও আদিপাপ বর্জিতা। আমরা কেউ আদিপাপ বর্জিতা নই কিন্তু আমাদেরও চেষ্টা করতে হবে জগতের মোহ-মায়া হতে নিজেকে বিরত রাখতে।

❖ মা-মারীয়া যিশুর প্রথম অলৌকিক কর্মের সহকারিণী। আমাদেরও চেষ্টা করতে হবে খ্রিস্টের বাণী অন্যের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে যিশুর একনিষ্ঠ সেবক হয়ে উঠা।

❖ যিশুর প্রচার জীবনে মারীয়া বিনম্রা ও বিশ্বস্তা নারী। আমাদেরও প্রত্যেককে বিনম্রচিত্তে যিশুর বাণী ধারণ ও বহন করতে হবে।

❖ মারীয়া ছিলেন বন্ধুসুলভ ও সুসম্পর্কের অধিকারী তাই মায়ের গুণে গুণান্বিতা হয়ে আমাদেরকেও সকলের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষার্থে কাজ করতে হবে।

❖ মা মারীয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণে সর্বদা সচেষ্ট থেকেছেন। তাই আমাদের জীবন ও ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণার্থে সমর্পণ করা।

❖ মা মারীয়া যেভাবে বিনম্রভাবে যাত্রা করেছেন এবং এলিজাবেথের সাথে আনন্দ সহভাগিতা করেছেন আমাদেরও ঠিক তেমনি মায়ের ছায়াতলে থেকে বিনম্রভাবে এই পৃথিবীতে যাত্রা করা এবং একে অন্যের সাথে সহভাগিতার মনোভাব গড়ে তোলা।

পরিশেষে, মা মারীয়ার আনন্দময় জীবনের পূর্ণ প্রকাশ হলো ঈশ্বরের নিকট নিজেকে সমর্পণ করা। যিশুর গোটা জীবনের সহযাত্রী হয়ে তিনি আনন্দে জীবনযাপন করেছেন। যুগে যুগে মারীয়ার দর্শনদানের মাধ্যমে জগতে, আশা-আনন্দ ও শান্তির বাণী দ্বারা নির্দেশনা দিয়েছেন। নিত্যদিনের জপমালা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা শান্তিকামী ও আনন্দচিত্তের মানুষ হয়ে উঠি। জপমালা প্রার্থনার মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের নিবেদন সকল মায়ের চরণে তুলে ধরি। মা মারীয়া আমাদের সেই সকল নিবেদন পিতার কাছে পৌঁছে দেন। তাই স্বর্গের পথে আশা নিয়ে যাত্রা করতে জপমালা প্রার্থনা হলো আমাদের অন্যতম হাতিয়ার। খ্রিস্টজন্ম জয়ন্তীতে পুনরায় আমাদের সংকল্প হোক "প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা, ঘরে ঘরে জপমালা"।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও তথ্যসূত্র: কস্তা এস দিলীপ: প্রণাম মারীয়া: দয়াময়ী মাতা, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ঢাকা।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

(৫ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

আজ্ঞাটি মেনে যথাসাধ্য অর্থদান করে আমরা যেন মণ্ডলী পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারি। আমাদের সমাজে অসংখ্য মানুষ আর্থিকভাবে ঋণের জালে বন্দী হয়ে আছে; ঋণের কারণে তাদের পরিবার নিয়ে তারা দুর্দশায় পড়ে আছে- তাদের জন্য আমরা কিছু করতে পারি কি না তা ভেবে দেখতে হবে। স্বার্থপরতা ত্যাগ করে উদার হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এই খ্রিস্টজয়ন্তী বর্ষ সমাপ্ত হবে আগামী ৬ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে যিশুর আত্মপ্রকাশ পর্বদিনে। আমরা সেদিন একসঙ্গে আমাদের ধর্মপ্রদেশের সকলে মিলে এই জয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি ঘোষণা করব। একই সঙ্গে আমরা মূল্যায়ন করে দেখব, এই জুবিলীবর্ষ পালন করে আমাদের কি কি অর্জন হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে আমাদের এখনো যা কিছু করা বাকী রয়ে গেছে বা এখনো যা যা করণীয় রয়েছে তা অর্জন করার চেষ্টাই হবে আমাদের অঙ্গীকার।

মানুষের হৃদয়ে মা মারীয়া ভক্ত মন্সিনিয়র দা কস্তা

ড. ইসিদোর গমেজ

দুইশত বছর পূর্বে বাংলায় কাথলিক মণ্ডলীর পরিচর্যার জন্য একজনও দেশীয় বা বাঙালি পুরোহিত ছিলেন না। প্রায় চার শত বছর আগে তৎকালীন ঢাকা জেলার শ্রীপুর বা লরিকুলের একজন বাঙালি সন্তান পুরোহিত হয়েছিলেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে, তার নাম মানুয়েল গ্রাসিয়া *(লুইস প্রভাত সরকার, ২০০২)*। তিনি ব্যান্ডেল চার্চে পালকীয় কাজে নিয়োজিত ছিলেন এবং ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মোঘলদের দ্বারা হুগলী ও ব্যান্ডেল চার্চ আক্রান্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে ফাদার মানুয়েল গ্রাসিয়া বন্দী হয়ে আগ্রায় নীত হয়েছিলেন। কিছুকাল পর আগ্রাতেই তার মৃত্যু হলে সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল।

বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্মের সূচনা ষোড়শ শতাব্দিতে হলেও ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের আগে স্থায়ী কোন গির্জা বা উপাসনা গৃহ স্থাপিত হয় নি। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের পাথরঘাটা, জামালখান ও দিয়াং এ ৩টি গির্জা স্থাপিত হয়েছিল। আর ঢাকা জেলার লরিকুল (১৬০০!), নারিন্দা (১৬১২), নাগরী (১৬৬৭), তেজগাঁও (১৬৭৭), পাদ্রিশিবপুর (১৭৬৪), হাসনাবাদ (১৭৭৭), ঈশ্বরীপুর (১৬০০) নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে পূর্ব বঙ্গে কাথলিক মণ্ডলী সুসংগঠিতভাবে মিশন কার্য পরিচালনা করে যখন চট্টগ্রাম ও ঢাকাকে ধর্মপ্রদেশে উন্নীত করা হয়। এর আগে পূর্ব বঙ্গের কাথলিকগণ গোয়া (পাদ্রোয়াদো), মাইলাপুর, কোলকাতা ভিকারিয়েট-এর অন্তর্ভুক্ত/অধীন ছিল।

প্রাথমিক পর্যায়ে এদেশে আগষ্টিনিয়ান, জেজুইট, বেনেডিকটাইন সম্প্রদায়ের যাজকগণ পরিচর্যা করলেও তাদের মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ্ব থাকার কারণে ধর্মপল্লীগুলো স্থায়ী রূপ লাভ করে নাই। বাকেরগঞ্জ এলাকায় পাদ্রিশিবপুর, ঢাকার নাগরী, হাসনাবাদ ও তেজগাঁও চার্চকে কেন্দ্র করে সুশৃঙ্খলভাবে মণ্ডলীর কার্যক্রম চলতে থাকে। তখন উল্লিখিত বেশীরভাগ চার্চের পালক পুরোহিত বা ভিকার ছিলেন পর্তুগীজ বা গোয়ানীজ এবং দক্ষিণ ভারতীয়। আঠারগ্রামের দুইটি (হাসনাবাদ ও তুইতাল), ভাওয়াল এলাকায় দুইটি (নাগরী ও পাঞ্জোরা), তেজগাঁও এবং বাকেরগঞ্জ (পাদ্রিশিবপুর) চার্চের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুরোহিতগণের বেশীরভাগই ছিলেন গোয়ানীজ ফাদার। ১৬৬৭ থেকে ১৯৪০ দশকের সময়কালে কয়েকজন যেমন ফাদার মারকুইস, ফাদার লবো, ফাদার মেনেজি, ফাদার মারিয়ানো দা সিলভা, ফাদার মানুয়েল দা রোজারিও, ফাদার পলিকার্প আলভারেজ, ফাদার এ. সি. গুডিনো, ফাদার ইসিদোর দা কস্তা, ফাদার জর্জ আন্ডাচেরী, ফাদার আন্তনী ডি' সুজা, ফাদার জেমস সলোমন, প্রমুখ সেবাকাজে নিয়োজিত ছিলেন। মিশনকাজে তাঁদের অবদান ও সমাজের মানুষের প্রতি ভালোবাসার ও যত্নের কথা আজও আঠারগ্রাম ও ভাওয়ালের বংশধরেরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। উল্লিখিত ফাদারদের মধ্যে একজন ছিলেন ফাদার (মনসিনিয়র) ইসিদোর ফ্রান্সিস দা কস্তা বা শুধুই দা কস্তা ফাদার। পালকীয় কাজের পাশাপাশি তাঁর অন্যান্য গুণাবলী সম্পর্কে আজকের লেখা। আমার জন্মের পর থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত দেখেছি ফাদার দা কস্তা একজন মুখভর্তি সাদা দাড়িযুক্ত উজ্জ্বল সৌম্য দীর্ঘদেহী সুস্বাস্থ্যের অধিকারী মানুষ। দেখলেই শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হতো, বলতাম "যিশুতে প্রণাম ফাদার"। কিছুটা নাকি সুরে উত্তর দিতেন, যিশুতে প্রণাম।

ইসিদোর ফ্রান্সিস দা কস্তা ১০ এপ্রিল ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে গোয়ার সালসেটি জেলার সিরলিম, চিনচিনিম নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আগুস্তো বা আগষ্টিন জেভিয়ার ভিসিটাসাও দা কস্তা। পর্তুগীজ ভাষায় ফাদার দা কস্তার বাপ্তিস্মের নাম লেখা হয়েছিল, (Isidoro Francisco Conceicao da Costa)।

খুব অল্প বয়সে ইসিদোর দা কস্তা সেমিনারীতে প্রবেশ করেন। গোয়ার সালসেটি শহরের রাচোল সেমিনারীতে তিনি দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব পড়া শেষ করেন। অতঃপর রাচোল সেমিনারীর চ্যাপেলে গোয়ার আর্চবিশপ দোম মাথায়াস ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে তাকে টনসার বা চূড়াকরণ দায়িত্ব (কেশ কর্তন/ মস্তক চাঁদি কামানো) প্রদান করেন। ঐ একই বছর আর্চবিশপ মাথ য়াস কর্তৃক ইসিদোর দা কস্তা মাইনর অর্ডার ব্রত লাভ করেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে সাবডিকন এবং ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ঐ একই চ্যাপেলে আর্চবিশপ মাথায়াস তাঁকে ডিকন পদে উন্নীত করেন। সবশেষে ১৩ মার্চ ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে গোয়ার পানজিম শহরের প্যাট্রিয়ার্ক চ্যাপেলে আর্চবিশপ দোম মাথিয়াস কর্তৃক তিনি যাজক পদে অভিষিক্ত হন।

ফাদার ইসিদোর দা কস্তা যাজক পদে অভিষিক্ত হবার পর প্রথম কোথায় দায়িত্ব পালন করেছেন সে সম্পর্কে এখনো তথ্য যোগাড় করা সম্ভব হয় নি। তবে দেড়-দুই বছর পর তার কর্মক্ষেত্র হিসেবে সম্ভবত ১৯১৪/১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে তিনি বঙ্গে আগমন করেন। প্রথম ২/৩ বছর তিনি কোলকাতার বৈঠকখানা গির্জায় পালকীয় দায়িত্ব পালন করেন এবং সেখানেই তিনি পূর্ব-বাংলার বাঙালিদের সংস্পর্শে আসেন। কোলকাতায় ইংরেজীর পাশাপাশি হিন্দির প্রচলন ছিল। ফাদার দা কস্তার মাতৃভাষা ছিল কংকানী। কোলকাতাতেই তিনি বাংলা ভাষা শিখেছিলেন। এরপর ১৯১৭-১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে তিনি চলে আসেন তৎকালীন পূর্ব বাংলায়, তথা প্রভুর বিস্তীর্ণ দ্রাক্ষাক্ষেত্রের একনিষ্ঠ মজুর হিসেবে। তিনি বাংলাকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসলেন, খ্রিস্টবিশ্বাসীদের এমন ভাবে আপন করে নিলেন, তাঁর আর নিজ দেশে ফিরে যাওয়া হয় নাই।

ফাদার দা কস্তা ঢাকা ধর্মপ্রদেশ ও মহাধর্মপ্রদেশের যে সকল ধর্মপল্লীতে পালকীয় দায়িত্ব পালন করেছিলেন তার একটি বিবরণ এরকম :

নাগরী সেন্ট নিকোলাস চার্চ (১৯১৮-১৯১৯ খ্রিঃ), তেজগাঁও হলি রোজারি চার্চ (১৯১৯- ১৯২০ খ্রিঃ), তুইতাল পবিত্র আত্মার চার্চ (১৯২১-১৯২৬ খ্রিঃ) এবং পুনরায় নভেম্বর ১৯২৮ থেকে জুন ১৯৩০ খ্রিঃ পর্যন্ত; পাদ্রিশিবপুর আওয়ার লেডি অফ গাইডেন্স চার্চ (১৯২২-১৯২৩ খ্রিঃ) এবং পুনরায় ফেব্রুয়ারি ১৯২৭ থেকে এপ্রিল ১৯২৮ খ্রিঃ, হাসনাবাদ পবিত্র জপমালা রাণীর চার্চ (জুন ১৯৩০ থেকে জুন ১৯৩১ খ্রিঃ), রাঙ্গামাটিয়া পবিত্র হৃদয়ের চার্চ (এপ্রিল ১৯৩৪ থেকে মে ১৯৩৮), পুনরায় হাসনাবাদ প্যারিশে জুন (১৯৩৮ থেকে ১৯৫৬ খ্রিঃ), নারায়নগঞ্জ সেন্ট পলস্ চার্চ (জানুয়ারি ১৯৫৬ থেকে অক্টোবর ১৯৭৪ পর্যন্ত (১৫ অক্টোবর মৃত্যু পর্যন্ত)। উল্লেখ্য ১৯৩১, ১৯৩২ ও ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ফাদার দা কস্তা কোন কোন ধর্মপল্লীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন তা এখনও সঠিকভাবে জানতে পারি নাই। তাঁর পালকীয় সেবার স্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ফাদার দা কস্তা আঠারগ্রাম অঞ্চলে দুটি ধর্মপল্লীতে প্রায় ২৭ বছর পালকীয় সেবা প্রদান করেছেন। তারপর নারায়নগঞ্জ সেন্ট পল্স চার্চে প্রায় ১৮ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে চার বছর ও নাগরীতে দুই বছর পালকীয় দায়িত্বে ছিলেন। এছাড়া তেজগাঁও ও পাদ্রিশিবপুর মিলিয়ে চার বছর মিশন কাজ করেছেন। অন্যান্য স্থানের তথ্য এখনও সংগ্রহ করা যায় নাই।

ফাদার দা কস্তা যেখানেই পালকীয় সেবায় গিয়েছেন সেখানকার খ্রিস্টভক্তগণ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। আঠারগ্রাম অঞ্চলে হাসনাবাদ মিশনে তিনি সবচেয়ে বেশী সময় ছিলেন। তিনি হাসনাবাদের স্বনামধন্য পালপুরোহিত এ.সি. নিসেফোরাস গোডিনহো এর সাথে মাত্র কয়েক মাস সহকারী পালপুরোহিত হিসেবে কাজ করেছিলেন (মে ১৯২৮ থেকে নভেম্বর ১৯২৮)। এর আগে তিনি তুইতাল মিশনের

দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সেটি ছিল তাঁর যৌবন বয়সের সবচেয়ে কঠিন কাজ। তুইতাল ধর্মপল্লীর জন্য প্রথম গির্জা ছিল বকচরে। বিভিন্ন বিরূপ পরিস্থিতির কারণে তুইতালের বর্তমান গির্জার জায়গায় নতুন গির্জা নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত হয়। বকচর গির্জার পরিবর্তে নতুন একটি গির্জা নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন ফাদার মার্কুইস লবো। কিন্তু গির্জার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের কিছুদিন পর ফাদার লবো ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২৮ মার্চ মৃত্যুবরণ করেন। তখন ফাদার ইসিদোর দা কস্তা ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে তুইতাল গির্জা নির্মাণের গুরু দায়িত্ব নিয়ে তুইতাল মিশনে যোগদান করেন। ফাদার লবো গির্জা নির্মাণের জন্য যে ঠিকাদারকে কাজ দিয়ে অগ্রিম টাকা দিয়েছিলেন সে কাজ ফেলে টাকা মেরে পালিয়ে গিয়েছিল। এরকম শূণ্য তহবিলে ফাদার দা কস্তা স্থানীয় মিশনবাসীদের সহযোগীতা চাইলে নতুন তুইতালের দুলাই মাষ্টার, পুরান তুইতালের ধনাই ডি' ক্রুজসহ অনেকে ফাদারের আহ্বানে এগিয়ে আসেন। ফাদারের তহবিলে নাকি এক টাকাও ছিল না। নতুন তুইতাল গ্রামের সাধু মাদ্বরের মা প্রথম ৭ টাকা ফাদারের গির্জা নির্মাণ ফান্ডে দান করেছিলেন। এভাবে ফাদার দা কস্তা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দ্রুত নির্মাণ কাজ শুরু করেন। কথিত আছে ফাদার নিজে খুব সাধারণ খাবার খেতেন, ভাতের পরিবর্তে সস্তা চিনা ও কাউনের জাউ খেতেন। অর্থ সাশ্রয়ের জন্য তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, গির্জার পূর্ব দিকের জমিতে পুকুর কাটা হবে, সেখানকার মাটি দিয়ে গির্জা নির্মাণ স্থানের দক্ষিণের মাঠে ইট পোড়ানো হবে। এভাবেই তুইতাল গির্জা ঘর নির্মাণের প্রয়োজনীয় সমস্ত ইট ফাদার দা কস্তার তত্ত্বাবধানে তৈরী হয়েছিল। অক্লান্ত পরিশ্রমের পর গির্জা নির্মাণ সম্পন্ন হয় এবং ফাদার দা কস্তাসহ তিন জন পুরোহিতের খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে নব-নির্মিত গির্জা "পবিত্র আত্মার" নামে ৮ জুন ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে আশীর্বাদিত ও উৎসর্গীকৃত করা হয়। প্রথম দফায় ফাদার দা কস্তা তুইতাল ধর্মপল্লীতে পাঁচ বছরের অধিক সময় ছিলেন। নতুন গির্জাঘর নির্মাণসহ তিনি ধর্মপল্লীর সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের ধর্মীয় গঠন ও আন্তরিক সেবা দান করেন। সমাজের অনেক মানুষের মধ্যে বিদ্যমান কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা করেন। তাঁর কাছে সর্বস্তরের মানুষের সহজ প্রবেশাধিকার ছিল। উপাসনায় ব্যবহারের জন্য মৌচাকের মোম সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত করে তারপর গির্জায় ব্যবহার করা শিখিয়েছিলেন তিনি। বিশেষ বিশেষ পালা-পার্বণের জন্য মোটা লম্বা মোমবাতিও তৈরী করত তাঁর প্রশিক্ষিত লোকেরা। আগে গির্জা ঘরের মোমবাতি উপাসনা শেষে ফুঁ দিয়ে নেভানো হতো। তিনি লম্বা লাঠির মাথায় ছোট্ট টুপি বসিয়ে দিলেন। ওটা দিয়ে খুব সহজেই মোমবাতি নেভানো হতো। ফাদার দা কস্তা প্রথম যখন তুইতাল ধর্মপল্লীতে ছিলেন তখন তাঁর অনেক ভক্ত সৃষ্টি হয়েছিল, তিনি তুইতাল ছেড়ে যাবার পরেও তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য খ্রিস্টভক্তগণ হাসনাবাদ, এমনকি নারায়নগঞ্জ চলে যেতেন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে তিনি তুইতাল ছেড়ে পাদ্রিশিবপুর মিশনে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বারের জন্য জুন ১৯৩০ হতে নভেম্বর ১৯৩১ পর্যন্ত ফাদার দা কস্তা তুইতালের পাল পুরোহিত হয়ে এসেছিলেন। তখন তুইতালের খ্রিস্টভক্তদের সংখ্যা ছিল ১১২০ জন। এরপর ফাদার দা কস্তা ভাওয়াল এলাকার রাঙ্গামাটিয়া মিশনে চার বছর দায়িত্বে ছিলেন (১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮)। এখানে তিনি গির্জার পশ্চিম অংশে জমি কিনেন যেখানে বর্তমান ফাদারের ঘর, বাবুর্চীখানা রয়েছে। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে তিনি আবার হাসনাবাদ মিশনে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তখন তিনি মিশন কাজে একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ পুরোহিত। দীর্ঘ প্রায় সাড়ে আঠারো বছর তিনি হাসনাবাদ ধর্মপল্লীতে সেবা দিয়েছেন। সেখানে তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী আরও বিকশিত হতে থাকে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের তিনি নিজে ক্যাটিকিজম/ধর্ম ক্লাশ নিতেন। প্রতিটি শিশুর পরিবারের খোঁজ খবর নিতেন। দরিদ্র অনাথ শিশু/কিশোরদের পড়াশোনার জন্য বই-খাতা কিনে দিতেন। শিশুরাও ফাদারের সাথে সহজ ভাবে কথা বলতো, মনের ইচ্ছা প্রকাশ করতো। কেউ বলতো আমি সিস্টার হব, কেউ বলতো আমি ফাদার হবো। একজন অতি নম্র ও ভদ্র বালক ফাদারের কাছে আসতো তার মায়ের সাথে। মিসায় সেবক হতো। মা ফাদার দা কস্তার কাছে ছেলেকে নিয়ে বলতেন, ফাদার আমার ছেলেকে আশীর্বাদ করেন সে যেন ফাদার হতে পারে। ফাদার দা কস্তা বালকটির মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, তুমি অনেক বড় পুরোহিত হবে। সেই বালক সত্যিই পুরোহিত হয়েছিল, তিনিই হয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রথম বাঙ্গালী বিশপ এবং আর্চবিশপ- ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়ান অমল গাঙ্গুলী।

ফাদার দা কস্তা দেখলেন হাসনাবাদ তুইতাল এলাকায় কোন ভাল ডাক্তার নেই। তিনি হোমিওপ্যাথিক/বায়োকেমিক এর বই কিনে পড়তে লাগলেন। কোলকাতা ও গোয়া থেকে কিছু ট্রেনিংও নিলেন। তারপর তিনি সাধারণ অসুখ বিসুখের চিকিৎসা দিতেন। এছাড়া তিনি আয়ুর্বেদিক জ্ঞানও লাভ করেছিলেন। আমার বাবা মাইকেল মাষ্টারও ফাদারের একনিষ্ঠ ভক্ত হিসেবে অনেক ঔষধ ব্যবহার করতেন। এখনও হাসনাবাদে কয়েকজন জীবিত মানুষ আছেন, যারা ফাদার দা কস্তার ঔষধ সেবন করে সুস্থ হয়েছেন। চতুর্থীর বাড়ির বার্নাডেট তাদের মধ্যে একজন। বার্নাডেট ডি' কস্তার বয়স এখন ৯২। তাঁর প্রখর স্মৃতি শক্তি। ফাদার দা কস্তার কথা শুনলেই তার মাথা নত হয়ে যায়। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই বার্নাডেট ও ফিলিপ ডি' কস্তার বিবাহ ফাদার দা কস্তা দিয়েছিলেন। বিবাহের পর যখন সন্তান সম্ভবা হলেন, সে সময় ফাদার তাঁকে ঔষধ দিতেন যেন সন্তান সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে জন্মগ্রহণ করে। পরের বছর জুন মাসে তাদের প্রথম সন্তানের জন্ম হয়।

হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর ইমামনগর গ্রামের আন্তনী বেঙ্গা গমেজ এর কন্যা তেরেজার বয়স এখন ৮৪ বছর। তার বাপ্তিস্ম ও প্রথম কম্যুনিয়ন ফাদার দা কস্তার হাতে হয়েছিল। ফাদারের কাছে তার ধর্ম শিক্ষা কেমন ছিল তা তার স্পষ্ট মনে আছে। ফাদার দা কস্তার শ্মশ্রুমণ্ডিত অবয়ব তার স্মৃতিতে এখনও ভাসমান। তিনি আরো বলেন, ফাদার দা কস্তা মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের খবর নিতেন এবং সাহায্য করতেন। শুধু খ্রিস্টান নয়, মুসলমান ও হিন্দু সমাজের মানুষেরাও তাঁকে সম্মান/শ্রদ্ধা করতো। ফাদার তাদেরকেও সাহায্য করতেন। তেরেজার দিদিমা'র বাড়ি তুইতাল মিশনে। তার মায়ের কাছে শুনেছেন, ফাদার দা কস্তার প্রার্থনায় নাকি ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাত থেমে যেত। একবার পুরান তুইতাল গ্রামের ফাত্রার বাড়িতে প্রচণ্ড আগুন লাগে। তখন ফাদার দা কস্তার প্রার্থনায় সেই আগুন নিভে গিয়েছিল। সাধারণ খ্রিস্টভক্তগণ বিশ্বাস করতো, ফাদার দা কস্তার প্রার্থনায় ফল পাওয়া যায়।

হাসনাবাদ গ্রামের একটি পরিবার আজীবন ফাদার দা কস্তার নিকট কৃতজ্ঞ। কোড়াইয়ার বাড়ির বারবারা, তিনি এখন লন্ডনবাসী, আমার আত্মীয়। বর্তমানে তার বয়স ৯০ বছর।

(ফা. দা কস্তা, মাইকেল মাষ্টার পরিবার) (বারবারা গমেজ, লন্ডন) (বার্নাডেট ডি' কস্তা) (তেরেজা রোজারিও)

তাঁর জীবনে ফাদার দা কস্তার অবদান তিনি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় অন্যান্য ছেলে মেয়েদের সাথে ফাদার দা কস্তার কাছে ধর্ম ক্লাশ করতে যেতেন। পরিবারের অবস্থা ভাল ছিল না, কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বম্বিং এ জাহাজ ডুবে যায়। ফাদার জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমরা কয় ভাই বোন? তখন বারবারা কেঁদে দিয়ে বলেছিল, আমার কোন ভাই নেই, আমার বাবাও হারিয়ে গেছে। তখন ফাদার বলেছিলেন, আমি তোমাদের ভাই-তোমার স্কুলের বই পত্র আমি কিনে দিব। তুমি কি সিস্টার হতে চাও? বাববারা মুখ ফস্‌কে বলে ফেলে- না ফাদার আমি বিয়ে হবো। ফাদার একটুও অসন্তুষ্ট হন নাই।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় আঠারগ্রামের কম করে হলেও ২০/২৫ জন খ্রিস্টান জাহাজী মৃত্যুবরণ করেছিল। ফাদার দা কস্তা বারবারার বাবার ব্যাপারে কোলকাতাস্থ শিপিং কোম্পানীতে চিঠিপত্র/আবেদন লিখে যোগাযোগ করতে লাগলেন। আরো অনেকের স্বামী বা ছেলে নিখোঁজ ছিল। দীর্ঘ দুই বছর চেষ্টার পর ফাদার সফল হয়েছিলেন। বারবারা'র মা মনিকা পেতেন মাসে পনের টাকা এবং তিন বোন পেত দুই টাকা করে ছয় টাকা। বারবারা মাত্র ষোল বছর বয়সে নতুন তুইতাল গ্রামের সিলভেষ্টার গমেজ এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ফাদার ইসিদোর দা কস্তা ১৯ এপ্রিল ১৯৫০ তারিখে হাসনাবাদ গির্জায় তাদের বিবাহ সংস্কার প্রদান করেন। তুইতাল চার্চের মানুষ হলেও বারবারার দুই সন্তানের (ফ্রান্সিস ও আনাস্তাসিয়া) বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন ফাদার দা কস্তা। বারবারার স্বামী সিলভেষ্টার লন্ডনে চাকুরী করতেন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে বারবারা দুই ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়ে লন্ডন চলে যান। যাবার আগে তারা সবাই নারায়নগঞ্জ গিয়ে ফাদার দা কস্তার আশীর্বাদ নিয়েছিলেন। বারবারার পরিবারের মত আরো অনেক মানুষ ফাদার ডি' কস্তার আশীর্বাদ নিতে যেতেন।

রাঙ্গামাটিয়া মিশনের মাথায়াস রিবেরু ফাদার দা কস্তার খুব ভক্ত ছিলেন। তার কৃতি সন্তান চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু শৈশবকালে মাঝে মাঝে অসুস্থ হতেন। তাঁর মনে আছে তার বাবা তাকে নারায়নগঞ্জ নিয়ে যেতেন ফাদার দা কস্তার কাছে। ফাদার দা কস্তা তাকে হোমিপ্যাথিক/বায়োকেমিক ঔষধ দিতেন। তাঁর ঔষধ সেবন করে চিত্ত রিবেরু সুস্থ হয়েছিলেন। তিনি আরও বলেন রাঙ্গামাটিয়া মিশনে থাকার সময় ফাদার গাছ-গাছরা দিয়ে ঔষধ তৈরী করে অনেককে চিকিৎসা করে সুস্থ করেছেন।

বড় কোন মানসিক সমস্যা ও বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ফাদার দা কস্তা আমাকে "চার শব্দের" একটি প্রার্থনা শিখিয়েছিলেন। সেটি ছিল, অনবরত আওরানো- "হে আমার যিশুর দয়া, হে আমার যিশুর দয়া।" আজও বিপদে আপদে আমি এই ছোট্ট প্রার্থনা করে থাকি। তিনি নারায়নগঞ্জ থাকার সময়, তাঁর পুরানো অনেক ভক্ত তাঁর কাছে যেতেন মানসিক শান্তি লাভের জন্য। এমনি একজন ছিলেন তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পিটার রড্রিকস। তিনি চাকুরী করতেন পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে। আগে থেকেই তিনি ফাদার দা কস্তার আধ্যাত্মিক গুণাবলীর কথা জানতেন। একসময় তিনি নারায়নগঞ্জ মহকুমার পোষ্টাল ইনসপেক্টরের দায়িত্ব পালন করেছেন। ফলে ঘন ঘন নারায়নগঞ্জ যাতায়াত ছিল সেন্ট পলস্ গির্জায়। পিটার রড্রিকস যখনই মানসিক চাপে থাকতেন বা কোন অশান্তিতে ভুগতেন তিনি চলে যেতেন নারায়নগঞ্জে ফাদার দা কস্তার কাছে। ফাদারের সাথে মনের কথা বলে আশীর্বাদ নিয়ে ফিরতেন মানসিক প্রশান্তি নিয়ে।

একসময় আমাদের আঠারগ্রাম অঞ্চলে ভূতের উৎপাত ছিল। ফাদার দা কস্তা বিশেষ প্রার্থনার মাধ্যমে অনেক ভূতগ্রস্ত মানুষকে সুস্থ করেছেন। আমার নিজের দেখা ও জানা বেশ কয়েকজন তার মাধ্যমে সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন। এদের মধ্যে কয়েকজন এখনও জীবিত আছেন। ভূতগ্রস্ত মানুষের ভূত ছাড়ানোর প্রক্রিয়াটি ছিল বেশ কষ্টসাধ্য। ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির পিতা/মাতাকে নির্দেশ দিতেন, চিকিৎসার তিন দিন আগে থেকে উপবাস ও প্রার্থনা করতে। ফাদার নিজেও সম্পূর্ণ উপবাসে থাকতেন সারা রাত একটি অমসৃণ ইটের উপর হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করতেন। তখন তাঁর হাঁটুতে ক্ষতের সৃষ্টি হতো। তিনি ভূতগ্রস্ত রোগী ও উপস্থিত পরিবারের সবাইকে গির্জার ভিতরে নিয়ে যেতেন। ফাদার বেদীর সামনে উপুড় হয়ে জোরে জোরে প্রার্থনা উচ্চারণ করতেন। হঠাৎ একসময় ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত। তখন ঝড়ের মত বাতাসে গির্জার দরজা-জানালার কপাট খুলে অদৃশ্য কি যেন প্রস্থান করতো। কিছুক্ষণের মধ্যে লোকটি স্বাভাবিক মানুষের মত উঠে দাঁড়াতো। তখন ফাদারকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাতো। ফাদার সবাইকে আশীর্বাদ দিয়ে নিজের ঘরে চলে যেতেন। আমি এরকম একটি ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হতে পেরেছিলাম। সেটি ছিল ১৯৬৮/১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের দিকে। ফাদার দা কস্তা ছিলেন আমার আধ্যাত্মিক গুরু। তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি কি ভাবে ভূত ছাড়ান? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, তুমিও পারবে যদি ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে সঠিকভাবে প্রার্থনা ও সংস্কার পালন কর।

আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ফাদার দা কস্তাকে কাছ থেকে দেখার। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি হাসনাবাদ মিশন থেকে নারায়ণগঞ্জ সেন্ট পলস্ গির্জায় পালকীয় দায়িত্ব নিয়ে চলে আসেন। আমার বাবা মাসে অন্ততঃ একবার নারায়ণগঞ্জ ফাদার দা কস্তার কাছে আসতেন। মাঝে মাঝে আমাকেও সাথে করে নিয়ে আসতেন। বান্দুরা বা বালুগন্ডা থেকে লঞ্চে এসে ফতুল্লা ঘাটে নামতাম, তারপর রিক্সায় চাষাড়া রেল গেইট পার হয়ে নারায়নগঞ্জ গির্জার সামনে পৌঁছতাম। গির্জা ও ফাদারের ঘর একেবারে মেইন রোডের উপর। বাবা গ্রাম থেকে ফাদারের জন্য টুকটাক অনেক কিছু নিয়ে আসতেন। ফাদারের পছন্দ ছিল কাউনের চাল, ভাজা মাছের টক, খেজুরের সিরকা ইত্যাদি। আমরা ফাদারের দোতলা দালানের নীচে ডাইনিং হলের পাশের রুমে থাকতাম। সকালে উঠে অবশ্যই ফাদারের মিসার সেবক হতাম। ফাদার নানারকম ভাল ভাল উপদেশ দিতেন, পড়া লেখায় উৎসাহ দিতেন।

ফাদার দা কস্তার একটি সখ ছিল, ডাক টিকেট সংগ্রহ করা। তিনি বিভিন্ন দেশের থাকা তাঁর পরিচিত আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবদের অনেক চিঠি লিখতেন। অনেকের সাথে সাথে ডাক টিকেট বিনিময় করতেন। ফলে তাঁর সংগ্রহে পৃথিবীর বহু দেশের কয়েক হাজার টিকেট ছিল। তাঁর কাছ থেকেই আমি ডাক টিকেট সংগ্রহের শখ পেয়েছিলাম। আমাকে তিনি শিখিয়েছিলেন কিভাবে নিজে নিজে টিকেটের এ্যালবাম তৈরী করতে হয়। খাম থেকে কিভাবে স্ট্যাম্প উঠাতে হয় এবং এ্যালবামে সাঁটাতে হয়। ফাদারের কাছ থেকে আমি ইন্ডিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের টিকেট পেতাম। আমিও তাঁকে মধ্যপ্রাচ্যের দুবাই, আরব, কুয়েত, বাহরাইন, মাস্কাট, কাতার, ওমান, লিবিয়ার টিকেট সংগ্রহ করে বিনিময় করতাম। তাঁর উৎসাহ ও সহযোগিতায় নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় আমার সংগ্রহে পৃথিবীর পঞ্চাশটি দেশের আটশ-এর বেশী ডাক টিকেট ছিল।

১৯৬৮-৬৯-১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে নটরডেম কলেজে পড়ার সময় আমি দুই/তিন সপ্তাহ পর পর শনিবার বিকেলে ফাদার দা কস্তার কাছে নারায়ণগঞ্জ চলে যেতাম। তখন তিনি বেশ বৃদ্ধ। আমি তার সাথে কথা বলতাম এবং অনেক ইতিহাস জানতাম। তিনি আমাকে শীতলক্ষ্যা নদীর ওপারে (গুদারা ঘাট পার হয়ে) গোদনাইল পাট ব্যবসা/শিল্প এলাকায়, সেখানে বসবাসকারী কয়েকটি এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ও হিন্দু পরিবার ভিজিট করতে নিয়ে যেতেন। একদিন ফাদার বললেন, "আরাধ্য সংস্কারের আরাধনা" জন্য একটি বই লিখেছি/সংকলন করেছি বাংলায়, আমার হাতের লেখা প্রেসের লোক বুঝতে পারবে না। তুমি সুন্দর করে লিখে দাও। আমি তার সেই প্রার্থনার পুস্তিকা হাতে লিখে দিয়েছিলাম। সেই পুস্তিকা ঢাকার আর্চবিশপ টি. এ. গাঙ্গুলীর অনুমোদনক্রমে (Feast of Bl. V. Mary, Queen) নিষ্কলংকা ধন্যা রাণী কুমারী মারীয়ার পার্বণ দিবসে, "আরাধ্য সংস্কারের আরাধনা"-মন্সিনিয়র ইসিদোর দা কস্তা কর্তৃক সংকলিত, ক্যাথিড্রাল প্রকাশনী থেকে বের হয়েছিল, ১৩ এপ্রিল ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে। দুই হাজার কপি ছাপা হয়েছিল। প্রতি কপির মূল্য ৪০ পয়সা।

আঠারগ্রাম, ভাওয়াল ও ঢাকার তেজগাঁও সহ বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে ফাদার দা কস্তার অবদান, তাঁর আধ্যাত্মিকতা, প্রার্থনাশীল জীবন এবং

খ্রিস্টভক্তদের প্রতি দায়িত্বশীলতা ইত্যাদি গুণাবলীতে সন্তুষ্ট হয়ে পুণ্যপিতা, পোপ দ্বাদশ পিউস ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ফাদার ইসিদোর দা কস্তাকে "মন্সিনিয়র" উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জসহ বিভিন্ন স্থানে এবং পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে কোলকাতা শহরে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধে। সে সময় নারায়ণগঞ্জ শহরে ও গীর্জার আশে পাশে অনেক হিন্দু পরিবার বাস করতো। সেই ভয়ানক দুর্যোগে ফাদার দা কস্তা অনেক হিন্দু পরিবারকে গির্জায় আশ্রয় দিয়ে তাদের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। উল্লেখ্য, ঐ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদী পার হয়ে একটি সংখ্যালঘু পরিবারকে সাহায্য করতে যাওয়ার সময় ফাদার রিচার্ড টি. নোভাক সিএসসি ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছিলেন।

ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর সাথে ফাদার দা কস্তার সম্পর্ক ছিল গুরু-শিষ্যের মত। থিওটোনিয়াস আট বছর বয়সেই ফাদার দা কস্তার সংস্পর্শে এসেছিলেন। থিওটোনিয়াস যখন ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীর ছাত্র তখন ফাদার দা কস্তা হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত। থিওটোনিয়াস বান্দুরা হলিক্রস স্কুল থেকে অত্যন্ত ভাল রেজাল্ট করে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে রাঁচি সেন্ট আলবার্ট সেমিনারীতে প্রবেশ করেন। যাওয়ার সময় ফাদার দা কস্তার আশীর্বাদ নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর মাত্র ছয় বছরে অধ্যয়ন শেষে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুন তারিখে রাঁচী সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রালে থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী যাজক পদে অভিষিক্ত হন। তখনও ফাদার দা কস্তা হাসনাবাদ প্যারিশের পালক পুরোহিত। তিনি থিওটোনিয়াস গমেজ এর বাপ্তিস্ম রেজিস্টারে তার নামের পাশে হাতে লিখলেন, Ordained Priest on 6th June 1946 at Ranchi . S/d I. F. Da Costa. ফাদার থিওটোনিয়াস পরবর্তীতে বিশপ হলেন, আর্চবিশপ হলেন, কিন্তু ফাদার দা কস্তার সাথে তাঁর সম্পর্ক রয়ে গেল গুরু-শিষ্যের। আর্চবিশপ গাঙ্গুলী বিশাল বড় ঢাকা আর্চ-ডায়োসিসের দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁকে অনেক রকম চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে। মন্সিনিয়র দা কস্তা তখন নারায়ণগঞ্জে, তাঁর বার্ধক্য চলছে। আর্চবিশপ সময় পেলেই চলে যেতেন তাঁর আধ্যাত্মিক গুরুর কাছে। ফাদার দা কস্তার শরীর স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে এবং নিজের কথা সহভাগীতা করতে। একদিন রমনার একজন সেমিনারীয়ান থিওটোনিয়াস প্রশান্ত রিবেরুকে বললেন, চল আমার সাথে নারায়ণগঞ্জে ফাদার দা কস্তাকে দেখতে। প্রশান্তকে পাশে বসিয়ে আর্চবিশপ তার ভক্সওয়াগন গাড়ী ড্রাইভ করে নারায়ণগঞ্জ চার্চে গেলেন। ভিতরে ঢুকে দেখলেন মন্সিনিয়র দা কস্তা একটি চেয়ারে বসে আছেন। তিনি "ইওর গ্রেস"বলার সাথে সাথে আর্চবিশপ গাঙ্গুলী নীচু হয়ে মন্সিনিয়র-এর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। কি অভূতপূর্ব দৃশ্য, অসীম বিনয় ও অপার ভক্তি ছিল থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর চরিত্রে! সেই দৃশ্য দেখা মানুষটি হলেন, ফাদার থিওটোনিয়াস প্রশান্ত রিবেরু। তিনি ভেবেছিলেন, এই সৌম্য ধর্মপুরুষ সাধু না হয়ে পারেন না। দুই জন ইউনিভার্সিটির ছাত্রী মন্সিনিয়র দা কস্তার প্রার্থনা ও ওষুধে সুস্থ হয়ে কিছু দান তাকে দিতে সেমিনারীয়ান প্রশান্ত'র হাতে দিলে, সে তা' আর্চবিশপ গাঙ্গুলীকে দেয়। আর্চবিশপ গাঙ্গুলী তা নিয়ে বলেন, "বেশ ভাল তো অনেকে তার মাধ্যমে ফল লাভ করে, কৃতজ্ঞতা জানায়।" এতে বুঝা যায় যে আরও অনেকে তার চিকিৎসা ও প্রার্থনায় ফল পেয়েছে।

১৫ অক্টোবর ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে মন্সিনিয়র ইসিদোর দা কস্তা ৮৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। দিনটি ছিল অভিলার সাধ্বী তেরেজার পার্বণ দিবস। সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে তাঁর মৃত্যু সংবাদ এভাবে লেখা হয়েছিল:

মনসিনিয়র ইসিদোর এফ, দা' কস্তার পরলোক গমন ১৯৭৪ সনের ১৫ অক্টোবর রাত সাড়ে আট ঘটিকায় হলিফ্যামিলি হাসপাতালে এই ঈশ্বর ও মা' মারীয়া ভক্ত মৃত্যুবরণ করেন।

মন্সিনিয়র ইসিদোর দা' কস্তা আর আমাদের মাঝে নেই। বিগত ১৫ আক্টোবর মঙ্গলবার -----আটটায় ঢাকার হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরদিন বুধবার বিকেল পাঁচ ঘটিকায় তেজগাঁও গির্জায় আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, বিশপ যোয়াকিম এবং ফাদার টবিন সিএসসি মন্সিনিয়র দা' কস্তার আত্মার কল্যাণার্থে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে বহু পুরোহিত, সিস্টার এবং খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত থেকে তার প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন করেন।

মন্সিনিয়র দা' কস্তা ছিলেন ঢাকা মহা ধর্মপ্রদেশের সবচেয়ে বয়স্ক পুরোহিত। ৮৬ বছর বয়সের এই বৃদ্ধ পুরোহিত জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজ কর্তব্যে অটুট থেকে পরের মঙ্গল সাধনের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে গেলেন। এই বয়সেও তিনি নারায়ণগঞ্জ ধর্মপল্লীর পালকীয় কাজ চালিয়ে গেছেন। মৃত্যুর মাত্র তিন দিন পূর্বে তিনি অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হন।

মন্সিনিয়র দা' কস্তা ছিলেন একজন মহাপুরুষ। তাঁর আশীর্বাদ লাভ করে বহু রোগী এমন কি ভুতগ্রস্ত পর্যন্ত আরোগ্য লাভ করেছে। কুমারী মারীয়ার প্রতি ছিলো তাঁর অগাধ বিশ্বাস এবং ভক্তি। মারীয়ার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিলেন বলেই তিনি বৃদ্ধ বয়সে নারায়ণগঞ্জের একটি নির্জন কক্ষে একাকী থাকার সাহস পেতেন। তিনি বলতেন, মৃত্যুর সময় মা মারীয়া নিশ্চয়ই কোন না কোন পুরোহিত আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। ঠিকই মৃত্যুর পূর্বে তিনি শুধু পুরোহিত নন দু'জন বিশপও পেয়েছিলেন।

ছোট বড় সকলেই তাঁর শিশুসুলভ ব্যবহারে মুগ্ধ ছিলো। একজন আদর্শবান এবং একনিষ্ঠ পুরোহিত হিসেবে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তা ঢাকা মহাপ্রদেশের মণ্ডলীর ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবে। তাঁর যাজকীয় গুণাবলীতে সন্তুষ্ট হয়ে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে পোপ দ্বাদশ পিউস তাকে "মন্সিনিয়র" উপাধিতে ভূষিত করেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:
- ফাদার ড. থিওটোনিয়াস প্রশান্ত রিবেরু
- মিসেস বারবারা গমেজ, ফুলহাম, লন্ডন।
প্রতিবেশী--বর্ষ ১৯ সংখ্য। রবিবারঃ ২৭ অক্টোবর, ১৯৭৪। ৯ কার্তিক ১৩৮১।

১১তম মৃত্যু বার্ষিকী

নাম: প্রয়াত প্রভাত জেম্‌স গমেজ
জন্ম: ৭ আগস্ট, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২২ অক্টোবর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: জয়রামবের, পো:অ: রাঙ্গামাটিয়া,
থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

"তুমি দিয়েছিলে, তুমিই নিয়েছ প্রভু,
ধন্য তোমার নাম।
তোমারি পৃথিবী, তোমারি স্বর্গ,
পুণ্য সকল ধাম ॥"

বাবা, দেখতে দেখতে ১১ টি বছর পার হয়ে গেল আমাদের ছেড়ে তুমি চলে গেছ স্বর্গীয় পিতার কাছে। বাবা, আমরা তোমাকে ভুলিনি আর ভুলতেও পারবো না কোন দিন। তোমার স্নেহ, ভালবাসা, তোমার শূন্যতা আমরা অনুভব করি সর্বদাই। বাবা, তোমার অভাব প্রতিটি ক্ষণে আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। প্রতিটি কাজে, প্রতিটি মুহূর্তে তোমাকে অনেক বেশি মনে পড়ে। আজ এই দিনে স্বর্গস্থ পিতার কাছে প্রার্থনা করি যেন আমাদের বাবাকে চিরশান্তি ও শ্বাশত জীবন দান করেন। তুমি ছিলে অতি সৎ, নীতিবান, দয়ালু, অতিথিপরায়ন, মিশুক এবং অত্যন্ত পরিশ্রমী একজন মানুষ।

আমরা গভীর ভাবে বিশ্বাস করি, তুমি আছ পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চিরশান্তির ঐ স্বর্গধামে। বাবা, তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ কর যেন আমরা খ্রিস্টীয় আদর্শে সঞ্জীবিত হয়ে সুখে, শান্তিতে ও সৎ ভাবে আমাদের মাকে নিয়ে জীবন যাপন করতে পারি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে-
আমাদের মা- জ্যোৎস্না গমেজ।
ছেলে ও ছেলে বউ: রকি- স্নিগ্ধা, রাজু-মৌসুমী ও সাজু-স্নিগ্ধা
মেয়ে ও মেয়ে জামাই: রনিতা-প্রদীপ, লাভলী-প্রশান্ত ও কবিতা-লরেন্স
এবং আদরের নাতি-নাতনী ও আত্মীয়স্বজন।

বিজ্ঞ/২২৯/২৫

(গত ৩৩ সংখ্যার পরবর্তী অংশ)

বরিশালের লাল গির্জা এবং খ্রিস্টানদের গোড়াপত্তন

মিথুশিলাক মুরমু

বরিশালে খ্রিস্টধর্ম প্রবর্তিত হয়েছে তৎকালীন বাকেরগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট মি. গ্যারেটের হাত ধরে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের দিকে। বাকেরগঞ্জের সদরদপ্তর ছিলো বরিশাল। অধিকাংশ খ্রিস্টানুসারীরা ছিলেন ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের, যতসামান্য চার্চ অব ইংল্যাণ্ড ও রোমান কাথলিক। শ্রীরামপুর মিশনের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় গৌরনদীর নিম্নবর্ণের হিন্দুরা যিশুকে গ্রহণ করেছিলেন। লক্ষ্যণীয় যে, মুসলমান ও উচ্চবর্ণের হিন্দুদেরকে খ্রিস্টের বাণী আকৃষ্ট করতে পারেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম আদমশুমারী ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে বাকেরগঞ্জ জেলায় ৫৫৯১ জন খ্রিস্টানের উপস্থিতি ভুক্তি হয়েছে। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৯ হাজার ৩৫৭ এবং ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ১১ হাজার ২৪৫ জন। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে পাওয়া যায় ১১ হাজার ৭৭৬ জন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত খোসালচন্দ্র রায় প্রণীত বাকেরগঞ্জের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, *'বাকেরগঞ্জের ম্যাজিষ্ট্রেট মি. গেরেট সাহেবের সময় ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রথমে এদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচার আরম্ভ হয়। উক্ত সাহেব বাহাদুর স্বয়ং অবগাহমণ্ডলী ভুক্ত হইয়াছিলেন। গৌরনদী থানার অন্তর্গত আস্কর ও ধোনসার এ দেশীয় খ্রিস্টানদিগের প্রধান বসতি স্থান। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে গৌরনদীর অন্তর্গত বারোপাইকার খ্রিস্টানদিগের একটি মোকাদ্দমা হইয়া গিয়াছে। উহা দ্বারা এ দেশীয় খ্রিস্ট সমাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এ দেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারকগণ যেরূপ উৎসাহ ও উদ্যমসহকারে প্রচার কার্যনির্বাহ করিতেছেন তাহার অতুল্য ফল পাইতেছেন না। নিম্নশ্রেণীর কতকগুলি চণ্ডাল ব্যতীত অপর কেহই তাহাদিগের দলভুক্ত হয় নাই। উক্ত চণ্ডালদিগের মধ্যেও কেহ কেহ হিন্দুশাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় হিন্দু হইতেছে। ইহাদিগকে ফিরতি খোচ বলে। মি. জুশন ও মি. উইলিয়াম কেরী সাহেবের যত্নে বরিশালে যে একটি বাইবেল ক্লাস খোলা হইয়াছে, তদ্দারা বহু সংখ্যক বালকের নৈতিক উপকার সাধিত হইতেছে। ইহাই খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই স্কুলটির জন্য বরিশালবাসী উক্ত মহাত্মাগণের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন। খ্রিস্টানগণ যিশুখ্রিস্টকে ঈশ্বরের অবতার মনে করেন, তিনি ভিন্ন আর কেহই মানুষের পাপ মোচন করিতে সক্ষম নহে। যিশুকে ভজনা না করিলে অনন্ত নরকে ডুবিতে হইবে, ইহাই তাহাদিগের ধর্মমত। ৪৬৫৯ জন খ্রিস্টান বাস করেন।'* হেনরি বেভারিজ তার The District of Bakarganj: Its History and Statistics (1876) নামের আঁকর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, লোকগণনায় প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের কারণে অনেক খ্রিস্টান বাকেরগঞ্জের বাইরে পড়ে গেছেন। তার মতে, বাকেরগঞ্জে খ্রিস্টানদের সংখ্যা বাংলার অন্যান্য এলাকার তুলনায় বেশি এবং তা সম্ভব হয়েছে মিশনারীদের সাফল্যের কারণে। তিনি উল্লেখ করেছেন, তখন শিবপুরে এক পর্তুগিজ কলোনিতে অন্তত ৮০০ জন রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান বসবাস করতেন। জেলার উত্তরাংশে যে খ্রিস্টানুসারীদের বসবাস ছিলো, তারা সবাই ধর্মান্তরিত হওয়ার পূর্বে ছিলেন চণ্ডাল কিংবা নিম্নবর্ণের হিন্দু। বেভারিজের তথ্যানুযায়ী, বাকেরগঞ্জে একজন মুসলিমও খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেননি। তার মতে, মুসলমানরাই মিশনারীদের কাজে সবচেয়ে বড় বাধা। বাকেরগঞ্জের উত্তরাংশে মিশনারীদের সফলতার পেছনে তিনি কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন স্থানীয় ভূস্বামী ও তাদের পাইক-পেয়াদাদের অত্যাধিক অত্যাচার। তাদের কাছে খ্রিস্টধর্মের সামাজিক ন্যায়বিচারের বাণী আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। অন্যদিকে পাদ্রিরা জমির মালিক ও এই গরিব চণ্ডালদের মধ্যে রক্ষাকবচের মতো দাঁড়িয়েছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে ভূস্বামীরা মিশনারীদের বিরোধিতা শুরু করেন। এটা মূলতঃ হয়েছিল তাদের বৈষয়িক স্বার্থে আঘাত লাগার কারণে। এমনকি একজন খ্রিস্টান ভূস্বামীও ছিলেন এদের মধ্যে। বেভারিজ জানাচ্ছেন, এ দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল ২০ বছর আগে। তখন স্থানীয় কয়েকটি খ্রিস্টান পরিবারকে অপহরণ ও বন্দি করে রাখা হয়েছিল। এ ঘটনা আদালত পর্যন্ত গড়ায়, যা বারোপাইকা কেস নামে সুপরিচিত। এ মামলা বাকেরগঞ্জ জেলা, কলকাতা, এমনকি ইংল্যাণ্ডে আলোড়ন তুলেছিল। বেভারিজের বিবেচনায় পুরো ঘটনাটি সত্য সত্যই ঘটেছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আপিল আদালতে অভিযুক্তরা খালাস পেয়ে যান।

ম্যাজিষ্ট্রেট গ্যারেটে একজন নিষ্ঠাবান ব্যাপ্টিষ্ট ছিলেন এবং তার নাজির মি. পারি সক্রিয় ধর্মপ্রচারকের ভূমিকা পালন করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি যশোরে মিশনারী হিসেবে সুসমাচার প্রচার করেছেন। কিছুদিন অতিবাহিতের পর মি. পারি'র স্থলে মি. স্মিথ ও মি. সিলভেস্টার বারেইরো পৌঁছেছিলেন। সিলভেস্টার এসেছিলেন চট্টগ্রাম থেকে এবং বরিশালে কিছুদিন স্কুলে শিক্ষকতাও করেন। নৈতিক স্খলনের দায়ে অভিযুক্ত হলে চার্চ অব ইংল্যান্ড বর্তমানে চার্চ অব বাংলাদেশে যোগ দেন, কলকাতার বিশপ এদের স্বীকৃতিও দিয়েছিলেন। বাকেরগঞ্জ অঞ্চলে খ্রিস্টান অনুসারীদের বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন মি. জন চেম্বারলিন পেজ। এই ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী নিরলসভাবে কাজ করে কয়েক বছরের মধ্যেই অনেকেই খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। বরিশালের মাটিতে পা দিয়েছেন ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৮ নভেম্বর। তার জন্ম বিহারের মুঙ্গেরে এক সামরিক পরিবারে। বাবা ছিলেন কোম্পানীর সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন, আর মা ছিলেন এক কর্ণেলের মেয়ে। তার বাবার সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব ছিল সে আমলের বিখ্যাত ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী চেম্বারলিনের সঙ্গে এবং তিনি তার নামেই নিজের ছেলের নাম রেখেছিলেন। মি. জন চেম্বারলিন পেজ শিক্ষা জীবন ইংল্যান্ডে শেষ করে ভারতে ফিরে আসেন। মুঙ্গেরে তিনি অ্যান্ড্রু লেসলি নামের এক মিশনারীর ঘনিষ্ঠ হন এবং তার সঙ্গে শ্রীরামপুরে চলে আসেন। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে পেজ নিজেই মিশনারী হোন।

আরেকজন মিশনারী মি. সেলও তার কাজের জন্য স্থানীয় খ্রিস্ট বিশ্বাসী কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিলেন। প্রথমে কলকাতা, অতঃপর বরিশালে তার কাজের শুরুটা খুব একটা স্বস্তিদায়ক ছিল না। মি. সিলভেস্টার বারেইরোর স্থলাভিষিক্ত হয়েই বড়পাইকা মামলার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছিলো। ১৪জন স্থানীয় খ্রিস্ট বিশ্বাসীকে অপহরণ ও বন্দি করেছিলেন স্থানীয় জমিদার ও নীলচাষী। বিচারের মুখোমুখি হলে নিম্ন আদালতে রায় পেলেও আপিল আদালতে হেরে যান। বরং মিথ্যা গল্প সাজানোর জন্য খ্রিস্টানদের দায়ী করা হয়। শেষমেশ আদালত প্রথম রায় বহাল রেখেছিলেন কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের দেয়া রায় বদল করা যায় না বলে এটা ছিল আক্রান্ত খ্রিস্টানদের জন্য নৈতিক বিজয়। একবার পেজ ও তার দুই সহকারী মার্টিন ও অ্যান্ডারসন মিলে হিন্দু ও মুসলমানদের বিভিন্ন উৎসবে খ্রিস্ট ধর্মের প্রচারণা চালাতেন। কালিসুরিতে তারা একবার মুসলমানদের কোনো জামায়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে প্রায় দেড় লাখ মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। মার্টিনের কথায় এরা সবাই খেতে ও ফসল বেনা-কেনা করতে এসেছিলেন। ধারণা করা যায়, এটা কোনো বার্ষিক মেলা বা হাট হতে পারে। এ জমায়েতে তারা তিনজন সকাল ৭টা থেকে ১০টা এবং বিকেল ৩টা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রচারণা চালাতেন। এভাবে তারা পাঁচদিন কাজ করেন। তাদের ধর্ম প্রচারে খুচরো, খুঁতখুঁতে তর্ক ছাড়া সিরিয়াস ধরনের কোনো তর্ক-বিতর্ক কখনো হয়নি। এ পর্যায়ে মার্টিনের রেখে যাওয়া কিছু পর্যবেক্ষণ কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি লিখেছেন, সামাজিক

রীতিনীতি, নৈতিকতায় মুসলমানরা হিন্দুদের চেয়ে এগিয়ে। তারা যখন ব্রাহ্মণদের মধ্যে নিজেদের ধর্মীয় পুস্তকাদি বিতরণ করতেন, তখন কখনো আশা করতেন না যে তারা সেগুলো পড়বেন। মার্টিনের মতে, ব্রাহ্মণরা শিক্ষিত হলেও নিজ ধর্ম নিয়ে খুব একটা পড়াশোনা করেন না। হিন্দুরা তাদের ধর্মীয় ব্যবস্থার ওপর খুব যে আস্থা রাখেন, তেমনটাও মনে হয়নি মার্টিনের। তার কাছে মনে হয়েছে, স্থানীয় হিন্দুরা যে আচার-রীতি অনুসরণ করে, তা তাদের বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত সামাজিক রীতি, বর্ণ এবং স্টেরিওটাইপ। মার্টিন আরো বলেছেন, বাঙালিরা কোনো বিষয়ে সিরিয়াস আলাপে আগ্রহী নয়, বরং তারা রুপি, হুক্কা আর খাবার পেলেই সন্তুষ্ট। হিন্দুদের মধ্যে পাপ-পুণ্য নিয়ে কোনো আলাপ নেই। অন্যদিকে মুসলামনরা খ্রিস্টধর্মের অনেক বিষয়, গ্রন্থকে সত্য স্বীকার করবে, কিন্তু যেই যিশুকে ত্রাতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়, অমনি তারা ক্ষিপ্ত হবে এবং আপনাকে শত্রুজ্ঞান করবে। অন্যদিকে পেজ স্থানীয় ধর্মান্তরিতদের নৈতিক, ধর্মীয় বিকাশ নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। পুরো দুই দশক সময় তিনি বরিশালে একনিষ্ঠভাবে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের ২২ নভেম্বর দার্জিলিংয়ে তিনি দেহ ত্যাগ করেন।

বাকেরগঞ্জ অঞ্চলে ব্যাপ্টিষ্টদের প্রধান কেন্দ্র ছিল গৌরনদীর আস্কর ও ধোনসার। মি. বারেইরোর গির্জা ছিল ধনডোবায়। বেভারিজ জানাচ্ছেন, তার সময়ে এসে ধর্মান্তরের সংখ্যা একেবারে কমে এসেছে। তিনি লিখেছেন, সে সময়ে এসে মিশনারীদের কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে এসেছে। নতুন কাউকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দেয়ার চেয়ে তারা স্থানীয় খ্রিস্টান সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রাখতেই কাজ করছিলেন। কিন্তু এ কাজেও তারা পুরোপুরি সফলতা পাচ্ছিলেন না, অনেকে পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরে গিয়েছিলেন। এদের 'ফিরতি' বলে ডাকা হতো। হেনরি বেভারিজ এমন কয়েকজন ফিরতির সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছিলেন। তারা কেন পিতৃপুরুষের ধর্মে ফিরে গিয়েছিলেন, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করেন। তাদের একজন বেভারিজকে জানিয়েছিলেন, তিনি আর খ্রিস্টান থাকতে চাননি কারণ টেন কমান্ডমেন্ট'স পালন করার তার জন্য খুব কঠিন। তবে বেভারিজের নিজস্ব মত ছিলো এ ধর্মত্যাগীরা তাদের নিজস্ব সমাজে ফিরে যেতে আগ্রহী হয়েছিলেন। আরো একটি বড় কারণ মেয়েদের বিয়ে দেয়া। সে সময় স্থানীয় খ্রিস্টান সমাজে মেয়েদের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স ছিল ১৩ বছর। কিন্তু হিন্দুরা আরো আগেই মেয়েদের বিয়ে দিতেন। স্থানীয় খ্রিস্টানরা তখনো হিন্দু সংস্কৃতিকে ভুলে যাননি। তারা বিভিন্ন হিন্দু আচার অনুষ্ঠান পালন করতেন।

২০২১ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট ২৪ তারিখ আস্কর মণ্ডলী পরিদর্শনের সুযোগ পেয়েছিলাম। মণ্ডলীর সেক্রেটারী খুবই আগ্রহসহকারে জানাচ্ছিলেন, মিশনারী রেভা. উইলিয়াম কেরী বেশ কয়েকবার সুসমাচার প্রচারে পৌঁছিয়েছিলেন। তাঁরই প্রাণান্ত আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টায় ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে আস্কর মণ্ডলী স্থাপিত হয়। বরিশাল, আগৈলঝাড়া থানার আস্কর অত্র এলাকার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনতম মণ্ডলী। বর্তমান ইট-পাথরের গির্জাঘর নির্মাণের পূর্বে আরো কয়েকবার গির্জাঘর নির্মিত হয়, যেগুলোর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে নব নির্মিত আস্কর গির্জাটির অবয়ব ও গঠনশৈলী চমৎকার, দু'দিকে পুকুরের মাঝে দণ্ডায়মান গির্জাটি খ্রিস্টানুসারী ও বৃহত্তর সমাজের কাছে যিশু খ্রিস্টের সুসমাচারের প্রতীক হিসেবেই মূল্যায়িত। বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ কর্তৃক প্রণীত গান বই 'ধর্মগীত'-এর আভাষন লিখেছেন, উইলিয়াম কেরী, বরিশাল, অক্টোবর ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে। মহাত্মা ড. উইলিয়াম কেরী এবং বরিশালের রেভা. উইলিয়াম কেরী একই ব্যক্তি নন। ড. উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪) এবং রেভা. উইলিয়াম কেরী (মৃত্যু ১৯৩৫) কে অনেকেই এক ব্যক্তিরূপে মনে করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে তারা দু'জনই দুটি স্থানে কাজ করেছেন; ড. কেরী শ্রীরামপুর কেন্দ্রিক এবং রেভা. কেরী বৃহত্তর বর্তমানের বরিশাল-ফরিদপুর অঞ্চলে কাজ করেছেন। একদা বাখরগঞ্জ-ফরিদপুর ব্যাপ্টিষ্ট সম্মিলনীর 'মণ্ডলী' নামক একটি মাসিক পত্রিকা বরিশাল শহরের আদর্শ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। পত্রিকাটি ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট সংখ্যা (ভাদ্র ১৩৪০) থেকে জানা যায় যে, এর সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন এইচ. এম অ্যাঙ্গাস। এই মণ্ডলী পত্রিকাটির ১৭শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা (অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৩৫) একটি ফটোগ্রাফ (চিত্র) পাওয়া যায়। চিত্রটি পরিচয় এইভাবে দেওয়া হয়েছে।

চিত্র পরিচয়: 'যে মহাত্মার চিত্র দেওয়া হইল, তিনি যে কে তাহা এতদঞ্চলের ছেলে বুড়ো সবাই পরিজ্ঞাত আছে; তিনি হচ্ছেন মহাত্মা উইলিয়াম কেরী। ইহাঁরই কার্য্য ও পরিশ্রমের ফলে বাখরগঞ্জ ফরিদপুর ব্যাপ্টিষ্ট সম্মিলনীর সকল কার্য্য সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুব্যবস্থিত হইয়াছে। তিনি আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য বরিশালে যে স্কুল দুইটি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; তাহা তাঁহার যশ ও কীর্তি চিরদিন ঘোষণা করিবে। তাঁহার এই প্রতিষ্ঠান দুইটি সংরক্ষণার্থে সকলে যত্ন করিলে তাঁহার প্রতি প্রকৃতপক্ষে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইবে। মি. কেরী নিঃসন্তান ছিলেন কিন্তু তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিজ সন্তানের ন্যায় ভালবাসিতেন এবং বুড়ু বয়সেও ছোটদের মধ্যে এমনভাবে মিশিতেন যে তাহারা তাঁহার সঙ্গ পেতে বড়ই ভালবাসিত। মি. কেরীর ক্রোড়ে যে শিশুটি আছে, সে হচ্ছে আমাদের ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী সোসাইটির সেক্রেটারী মি. ওয়েলসের কন্যা। মি. কেরীর এই ছবি তাঁহার অন্তর্ধানের কিছুকাল পূর্বের; তিনি কেমন প্রফুল্লিত, এই ছবি দেখলেই বেশ বুঝা যায়'। কথিত আছেন, উইলিয়াম কেরী পর্তুগিজদের নিকট থেকে একটি মুসলমান মেয়েকে উদ্ধার করে তাকে লালন-পালন করে এক মুসলমান যুবকের নিকট বিয়ে দেন। এ মেয়ের নাম ছিল জিন্নাত বিবিন। কেরী তাকে জেনেট বলে আদর করে ডাকতেন। কেরী জেনেটের নামে শহরের গির্জা মহল্লা নিয়ে একটি তালুক ক্রয় করেন। এ তালুকের নাম ছিল জিন্নাত বিবি মহল্লা। ১৯০০-১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ভূমি জরিপে জিন্নাত বিবি ও কেরীর নাম উল্লেখ আছে। কেরী সাহেব অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী হাশেম আলী খানের বাড়ির পশ্চিম পাশে একটি কাঠের গির্জা নির্মাণ করেন। এটাই শহরের প্রথম গির্জা। জিন্নাত বিবি হাশেম আলী খানের বাড়ির ভূমির মালিক ছিলেন এবং সেখানে তার বাসগৃহ ছিল। জিন্নাত বিবি ১৯ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তার কোনো সন্তান ছিল না তবে পালক পুত্র ছিল। জিন্নাত বিবির মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি নিলামে বিক্রি হয়। এ সম্পত্তি এ্যাংলিকান চার্চ ও বামনার চৌধুরীরা ক্রয় করেন।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০১২ খ্রিস্টাব্দে চার্চ অব বাংলাদেশ-এর বরিশাল ডায়োসিস-এর যাত্রা শুরু হয়। ডায়োসিসের সূচনা ও দ্বারোঘাটন করতে এসেছিলেন Most Rev. Barry Morgan, Archbishop of Wales. সেদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন Most Rev. Paul S. Sarker, Moderator of Church of Bangladesh. গির্জার প্রবেশ দ্বারেই ফলকে লেখা রয়েছে গীত ১২৭: ১ পদ।

'সদাপ্রভু যদি গৃহ নির্মাণ না করেন

তবে নির্মাতারা বৃথাই পরিশ্রম করে।'

বরিশাল ডায়োসিসের ক্যাথিড্রাল হচ্ছে লাল গির্জা, পুরাতন লাল গির্জার নতুন অভিযাত্রা।

তথ্যসূত্র:

১. শ্রী ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস, বি.এ; বঙ্গে যীশুর বিজয় যাত্রা

২. রেভা. গর্ডন সডি, ব্যাপ্টিষ্ট ইন বাংলাদেশ। রেভা. সডি এ সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন The new station at Burrishol in Backergong. লক্ষ্য করুন বরিশালের এবং বাখেরগঞ্জ দুটি তখনকার দিনের বানান

৩. মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন সম্পাদিত, বাকেরগঞ্জ জেলার ইতিহাস

৪. বঙ্গে শতবর্ষ (অক্সফোর্ড মিশনের ইতিহাস ১৮৮০-১৯৮০খ্রি.), প্রকাশনায়– চার্চ অফ বাংলাদেশ

৫. ত্রৈমাসিক সমাস, প্রথম সংকলন ২০০৩, পূর্ণ পুনরুত্থান সংখ্যা, ন্যাশনাল খ্রিষ্টিয়ান ফেলোসিপ অফ বাংলাদেশ

৬. ইন্টারনেট

জল, জীবন ও প্রকৃতির উৎসব

ক্ষুদীরাম দাস

নব সভ্যতার ইতিহাসে নদীকে 'ধমনী' বলা হয়ে থাকে। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে নদীর তীরে গড়ে উঠেছে মানুষের বসতি, কৃষিকাজ ও বাণিজ্যের পথ। প্রাচীন মিশরের নীল নদ, সিন্ধু সভ্যতার সিন্ধু নদ কিংবা বাংলাদেশের পদ্মা-মেঘনা-যমুনা–সবই মানবজীবনের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে। নদী শুধু পানির উৎস নয়; বরং জীবিকার ভিত্তি, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার অন্যতম মাধ্যম এবং সংস্কৃতির ধারক। গান, সাহিত্য, লোককথা ও শিল্পকলায় নদীর উপস্থিতি আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের সাক্ষ্য বহন করে। নদীর এ গুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পবিত্র বাইবেলে জল ও জীবনের উৎস সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তিনি আমাকে জীবন জলের নদী দেখালেন-তা স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, ঈশ্বরের ও শাখার মেষশাবকের সিংহাসন হতে উৎসারিত।' *(প্রত্যাদেশ ২২:১)*। বর্তমান সময়ে নদী দূষণ, দখল, শিল্পবর্জ্য ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মারাত্মক সঙ্কটে পড়েছে। অনেক নদী তাদের অস্তিত্ব হারাচ্ছে, ফলে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যও হুমকির মুখে পড়ছে। নদী হারালে শুধু পানিসম্পদ নয়, আমাদের সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মও বিপন্ন হবে। তাই নদীর সুরক্ষা আজ সময়ের অপরিহার্য দাবি। এই সচেতনতা গড়ে তুলতেই প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসের শেষ রবিবার পালিত হয় বিশ্ব নদী দিবস। দিবসটি মানুষকে মনে করিয়ে দেয়–নদী কেবল ভৌগোলিক সীমানা নয়; বরং জীবন ও সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমাদের দায়িত্ব নদীকে রক্ষা করা, তার স্বাভাবিক প্রবাহ ফিরিয়ে দেওয়া এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে জীবন্ত করে রাখা।

দিবসের জন্মকথা ও ইতিহাস (History and Origin)

মানব সভ্যতার বিকাশে নদী ছিলো অন্যতম প্রধান অনুঘটক। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, পৃথিবীর প্রায় সব প্রাচীন সভ্যতা নদীকেন্দ্রিক হয়ে গড়ে উঠেছিলো। নদী আমাদের সংস্কৃতি, কৃষি, বাণিজ্য ও জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু বর্তমান সময়ে দখল, দূষণ, অব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বব্যাপী নদীগুলো মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। এ সঙ্কট মোকাবিলায় মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্যে একটি বৈশ্বিক উদ্যোগ প্রয়োজন ছিলো। সেই চিন্তা থেকেই জন্ম নেয় বিশ্ব নদী দিবস (World Rivers Day)। এ দিবসের প্রতিষ্ঠাতা হলেন কানাডার খ্যাতনামা নদী সংরক্ষণবাদী ও আইনজীবী মার্ক অ্যাঞ্জেলো। তিনি জীবনের প্রায় পুরোটা সময় নদী ও জলপথ সংরক্ষণে ব্যয় করেছেন এবং সমাজকে নদী রক্ষার গুরুত্ব বোঝাতে কাজ করেছেন। তাঁর উদ্যোগেই ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ে প্রথম পালিত হয় "ব্রিটিশ কলাম্বিয়া রিভার্স ডে"। ধীরে ধীরে এ উদ্যোগ জনপ্রিয়তা পেতে থাকে এবং মানুষের মধ্যে নদী নিয়ে নতুন করে ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি করে। পরবর্তী সময়ে, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত "জীবনের জন্য জল দশক (Water for Life Decade)"-এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিশ্বব্যাপী এ দিবস পালনের উদ্যোগ নেয়া হয়। জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে দিবসটিকে সমর্থন (Endorsed) প্রদান করে, ফলে এটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে এবং তখন থেকেই সেপ্টেম্বর মাসের শেষ রবিবারকে বিশ্ব নদী দিবস হিসেবে পালিত হতে শুরু করে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এ দিবস পালিত হয় এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংগঠন নদী রক্ষার গুরুত্ব নিয়ে নানা কর্মসূচি আয়োজন করে। বিশ্ব নদী দিবসের মূল উদ্দেশ্য হলো বিশ্ববাসীর কাছে নদী ও জলপথের অপরিসীম গুরুত্ব তুলে ধরা এবং সেগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা। নদী শুধু পানির উৎস নয়; এটি কৃষি, শিল্প, যোগাযোগ, পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্যের অন্যতম ভিত্তি। নদী ছাড়া মানবসভ্যতার টিকে থাকা কল্পনাই করা যায় না। অথচ আজ শিল্পবর্জ্য, প্লাস্টিক, দখল, বাঁধ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বহু নদী শুকিয়ে যাচ্ছে কিংবা দূষণে অচল হয়ে পড়ছে। এ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে হলে জনগণের মধ্যে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করা অপরিহার্য। বিশ্ব নদী দিবস ঠিক সেই ভূমিকা রাখছে–নদীর সঠিক ব্যবহার, দূষণমুক্ত রাখা এবং নদী পুনরুদ্ধারের জন্য মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করছে। আজকের দিনে নদী রক্ষার দায়িত্ব শুধু সরকার বা আন্তর্জাতিক সংস্থার নয়; প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত দায়িত্বও রয়েছে। প্লাস্টিক ব্যবহার কমানো, শিল্পবর্জ্য নদীতে ফেলা বন্ধ করা, নদী দখল প্রতিরোধে সচেতনতা তৈরি করা এবং স্থানীয় পর্যায়ে নদী পরিষ্কার রাখার উদ্যোগ নেয়া আমাদের সবার কর্তব্য। বিশ্ব নদী দিবসের মাধ্যমে এ দায়িত্ববোধকে আরো জোরালো করা হয়। সবমিলিয়ে বলা যায়, মার্ক অ্যাঞ্জেলো'র দূরদর্শী উদ্যোগ থেকেই যে দিবসের যাত্রা শুরু হয়েছিলো স্থানীয় পর্যায়ে, তা' আজ এক বৈশ্বিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। নদীকে রক্ষা করা মানে শুধু পানিসম্পদকে নয়; বরং পুরো মানবসভ্যতাকে রক্ষা করা। তাই বিশ্ব নদী দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়–নদী আমাদের প্রাণ, আর তাকে রক্ষা করাই আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার শর্ত।

নদী কেন অপরিহার্য? (Why Rivers are Essential?)

নদী জীবনের মূল ভিত্তি: নদী শুধু জলের উৎস নয়, এটি পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্র এবং মানবজাতির জন্যে এক জীবন্ত সত্তা। সভ্যতার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত নদীকে ঘিরেই মানুষের বসতি, কৃষি ও অর্থনীতি বিকশিত হয়েছে। পৃথিবীর মোট মিষ্টি জলের একটি বড় অংশ আসে নদী থেকে, যা' পানীয় জল, দৈনন্দিন গৃহস্থালি ব্যবহার ও কৃষিকাজের জন্য অপরিহার্য। নদী ছাড়া মানুষের জীবনযাত্রা কল্পনা করা যায় না।

কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তায় ভূমিকা: নদীর তীরবর্তী পলিমাটি পৃথিবীর সবচেয়ে উর্বর ভূমিগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ মাটিতে কৃষিকাজ সমৃদ্ধ হয় এবং কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। যেমন বাইবেলে বলা হয়েছে, "আমি গাছশূন্য উপপর্বতের উপর নদনদী উৎসারিত করব, উপত্যকার মাঝে স্থানে স্থানে ঝরণার জল প্রবাহিত করব।" *(ইসাইয়া ৪১:১৮)*। নদীর পানি সেচ ব্যবস্থার প্রধান উৎস হিসেবে কৃষিকে টিকিয়ে রাখে। মৎস্য সম্পদও নদীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নদী অসংখ্য মাছ ও জলজ প্রাণীর আবাসস্থল, যা কোটি মানুষের জীবিকা এবং পুষ্টির প্রধান ভিত্তি।

পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য: বৃক্ষ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে নদী একটি প্রাণদায়ী উৎস, যা জীবনধারণকে সমৃদ্ধ করে। নদী শুধু মানুষের জন্যে নয়, জীববৈচিত্র্যের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নদী ও নদী তীরবর্তী অঞ্চলগুলো এক বিশাল জীববৈচিত্র্যের আধার, যেখানে অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী বাস করে। পাশাপাশি নদী প্রাকৃতিক বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জল নিষ্কাশন ও মাটির উর্বরতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নদীর পানি সেচ ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য, এবং এর সহায়তায় জমি উর্বর হয়। নদী শুধু কৃষিকাজকে সমৃদ্ধ করে না, বরং এটি অসংখ্য মাছ ও জলজ প্রাণীর আবাসস্থল, যা কোটি মানুষের জীবিকা ও পুষ্টির মূল ভিত্তি। নদীর ধারা জীবনকে ধারাবাহিকভাবে বজায় রাখে এবং এর আশ্রয়ে মানুষ, পশু ও উদ্ভিদ সকলেই সমৃদ্ধ হয়। এইভাবে নদী ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও সৃষ্টি জীবনের এক অমূল্য অংশ হিসেবে মানবজাতির জন্য উপকারী। ইতিহাসের শুরু থেকেই নদী, মানুষ ও পণ্য পরিবহনের অন্যতম মাধ্যম, যা' অর্থনৈতিক বিকাশে ভূমিকা রেখেছে। তাছাড়া নদী নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনেও ব্যবহৃত হচ্ছে–বিশেষ করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে।

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক: নদীকে ঘিরে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলোর জন্ম হয়েছে। সিন্ধু, নীল, গঙ্গা ও টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদী মানবসভ্যতার সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত। এসব নদী শুধু ভৌগোলিক গুরুত্বের জন্যে নয়, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত। গান, কবিতা, লোকগাথা ও উৎসবে নদীর অনন্য উপস্থিতি প্রমাণ করে যে নদী মানুষের মানসিকতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।

নদী–এক জীবন্ত সত্তা: বিভিন্ন সংস্কৃতিতে নদীকে 'মা' বা জীবন্ত সত্তা হিসেবে সম্মান জানানো হয়। কারণ, নদী জীবন দেয়, জীবিকা দেয়, আবার প্রকৃতিকে টিকিয়ে রাখে। নদীর প্রতি মানুষের এই শ্রদ্ধা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, নদীকে রক্ষা করা মানে আমাদের অস্তিত্বকে রক্ষা করা। তাই নদীর সঠিক ব্যবহার ও সংরক্ষণ কেবল পরিবেশের ভারসাম্যের জন্য নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যেও একটি টেকসই পৃথিবী নিশ্চিত করার অপরিহার্য শর্ত। *(চলমান)*

(গত ৩২ সংখ্যার পরবর্তী অংশ)

তিন বুড়োর গল্প

যোসেফ শরৎ গমেজ

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে শংকর মেয়ে বিপাশাকে বলে আমি এখন বাজারে যাব, তোমার কী কী পছন্দ বলো? বিপাশা বলে বাবা আজকে তুমি বাজারে যাও, তোমার পছন্দের সব কিছু নিয়ে আসো। আগামীকাল আমি তোমার সাথে বাজারে যাব। আমার পছন্দের সব কিছু কিনে নিয়ে আসবো। শংকর বলে, ঠিক আছে তাই হবে।

চা নাস্তা খাওয়ার পর শংকর বাজারে যায়, বাড়ির কাছেই বাজার। মাত্র ৪ মিনিট সময় লাগে বাজারে যেতে। আজ সকাল সকালই বাজার বেশ জমে উঠেছে। শাকসবজি অনেক উঠেছে। অনেকদিন পর শাপলা দেখে শংকর আর লোভ সামলাতে পারল না মোটা মোটা বড় এক আটি কিনে ফেলল তারপর মাছের বাজারে গেল, ডিমওয়ালা বড় বড় চিংড়ী দেখে খুব খুশি হয় চিংড়ী মাছ দিয়ে শাপলা বহুদিন খাওয়া হয়নি। এক কুড়ি চিংড়ী মাছের দাম দিয়ে ঘুরতেই হঠাৎ দেখা হয়ে গেল শংকরের কাছের বন্ধু কমলের সাথে। শংকরকে দেখে কমল খুবই খুশী হয় একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কুশলাদি জিজ্ঞেস করে কমল বলে কবে এসেছ বিদেশ থেকে? গতকাল। ক' মাসের ছুটি? শংকর বলে আর ছুটি নয় বন্ধু একেবারেই চলে এসেছি। বল কি? তাহলে তো আমার ভাগ্য খুলে গেছে তোমার ভাগ্য খুলেছে মানে? তুমি এসে গেছো আস্তে আস্তে সব জানতে পারবে? আমরা তো এখন বুড়ো মানুষ। বুড়োর দলেই পড়ি। আমার ৭০ পার হলো, তোমার কত? তুমি তো আমার চেয়ে দু' এক বছরের ছোট হবে। শংকর বলল আমার ৬৯ বছর। হ্যাঁ ঠিকই বলেছ, আমরা তো বুড়োর দলে। কমল বলে দেখ শংকর তুমি দীর্ঘ দিন বিদেশে ছিলে বলেই এখনও অনেক ভাল আছ। শরীর, মন দু'ই ভাল। আমার দিকে দেখ সারাজীবন স্কুল মাষ্টারী করে জীবন পার করলাম এখন মন ছাড়া আর কিছুই সুস্থ্য নেই।

মাছের বাজারে দক্ষিণ দিকে অনেক লোক গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছে। শংকর আর কমল দু'জনেই ভীড় ঠেলে উকি দিয়ে দেখে এক জেলে অনেক বড় বড় ইলিশ নিয়ে বসেছে। ইলিশ মাছ দেখে শংকর দু'টো বড় ইলিশ দাম করে কিনে নেয় একটা ওর ব্যাগে অন্যটা কমলের ব্যাগে ভরে দেয়। কমল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে এটা কি করলে? শংকর মৃদু হেসে বলে কি করলাম সেটা পরে বলবো এখন চল বাড়ী যাই। আজ সন্ধ্যায় আমার বাড়ীতে আস। অনেক কথা আছে। কমল বলল না ভাই সন্ধ্যায় তোমার বাড়ীতে যেতে পারবো না। কারণ সন্ধ্যার পর আমি চলাফেরা করি না, আমি চোখে কম দেখি। আমি আগামীকাল সকাল ১০টা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে তোমার বাড়ীতে যাব।

কমল বাবু সারা জীবন শিক্ষকতা করেছেন তাই সময়ের মূল্য তার কাছে অনেক বেশী। ঠিক ১০টা ১৫ মিনিটে শংকরের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়। শংকর অত্যন্ত খুশী মনে কমলকে দোতলার দক্ষিণের ঘরটায় নিয়ে যায়।

অনেকদিন পর দু'বন্ধু এক সাথে বসে আড্ডা দেবে ভাবতেই ভাল লাগে। শংকর স্ত্রী মিথিলাকে কমলের আসার কথা জানিয়ে রেখেছিল। মিথিলা খুব যত্ন করে চিতই পিঠা আর পুদিনা পাতার ভর্তা বানিয়ে দু'বন্ধুর সামনে গরম গরম পরিবেশন করে। মিথিলাকে দেখে কমল জিজ্ঞেস করে মিথিলা কেমন আছো? ভালো আছি দাদা। বউদি ভাল আছে তো? তাকে সঙ্গে আননি? কমল বলে তার কি সময় আছে? সে এখন সংঘ সমিতি করে ঘুরে বেড়ায়। কি রকম সংঘ সমিতি? মিথিলা জানতে চায়। কমল বলে ঐ যে তোমরা কি বল দল। ছোট দল, বড় দল বুঝলে মিথি লা কয়েকটা দল আছে তার একটার নেত্রী তোমার বউদি। দল বেধে মিটিং করে আর মাঝে মাঝে ঘরে ঘরে গিয়ে টাকা তোলে। মিথিলা বলে আরে দাদা এতো ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ। কমল রাগত স্বরে বলে আমি এসব জানিনা কোন সমাজ কিসের সমাজ। যার স্বামী-সন্তান আর সংসারের প্রতি দায়িত্ব নেই তার সমাজে কোন মূল্য নেই। পিঠা খেতে খেতে শংকর বলে, আরে ভাই বউদির প্রতি এত খেপ্পা কেন? সভা, সমিতি করে এতো ভাল কথা। তুমি এসব বুঝবেনা। সারাজীবন তো বিদেশেই কাটালে মিথিলার মত একজন বউ পেয়ে সুখে জীবন কাটিয়ে দিলে। তা মন্দ বলনি কমলের প্রশংসা শুনে আর স্বামী শংকরের সম্মতি প্রকাশে মিথিলা খুশী মনে দুই কাপে কফি ঢেলে দুজনকে দেয় তারপর পিঠার খালি প্লেটগুলো তুলে নিয়ে আনন্দ চিত্তে কমলকে বলে, দুপুরে খেয়ে যাবে কিন্তু দাদা। একথা বলেই ভেতরে চলে যায়। অনেক দিন পর দুই বন্ধু গল্প শুরু করে। কমল জানতে চায় শংকরের প্রবাস জীবনের কথা। শংকর বলে, আমি মিডিল ইস্টের অনেক দেশেই কাজ করেছি। সাউদি, ওমান, কুয়েত, বাহরাইন। প্রতিটি দেশই উন্নত তাদের সম্পদের জন্য। আমাদের মত নয়, তাদের ভাষা এবং দেশের প্রতি ভালবাসা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। আমরা আমাদের মাতৃভাষা বাংলা সবসময় বলিনা। অন্য ভাষা না জানলেও ঐ ভাষাতে কথা বলি। অথচ বিদেশে তারা তাদের নিজের মাতৃভাষাতেই কথা বলে। তুমি সেই ভাষা বোঝ আর বা নাই বোঝ। আমরা গরীব। আমাদের দেশও গরীব তাই বলে মিসকিন নয়। মিসকিন শব্দটা খুব তাচ্ছিলের সাথে আমাদের উপর ব্যবহার করে। ঐসব দেশে অন্য সব বিষয় যেমন খাওয়া দাওয়ায় কোন ভেজাল নেই। দেশে আইন কানুন কাছে। রাস্তা ঘাটে চলাফেরায় কোন সম্যসা নেই। নেই হরতাল, মিছিল, মিটিং দলাদলি ভাংচুরা। এসব দিক দিয়ে শান্তিই শান্তি। তবুও ঐ দেশে আমার মন বসেনা। আমি ঐসব দেশে থাকতে চাই না। আমার মনটা পড়ে আছে আমার দেশে। আমার এই গায়ে। যেখানে আমার স্ত্রী-পুত্র ছেলে-মেয়ে, আমার ভাই-বোন, পাড়াপ্রতিবেশি বাস করে আমি যে তাদের কাছেই থাকতে চাই। শুধু পারিনি আমার ছেলে-মেয়ের কথা ভেবে। ওদের ভাল শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চাই। আর তার জন্য অর্থের প্রয়োজন। আর সেই অর্থের পেছনে জীবনের মূল্যবান সময়টা ব্যয় করেছি। শংকরের কথা শুনে কমল বলে হ্যাঁ এতো ভালই করেছ। সেই আশায়ই কর্মজীবন সমাপ্ত করে দেশে ফিরে এলাম। দোয়া করো যেন আমার আশা পূর্ণ হয়।

দুপুরের খাবার শেষে বড় একটা ঢেকুর তুলে কমল পরিতৃপ্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে। শংকর হাত ধুতে ধুতে বলে, কি ঠিক মত খেতে পারলে তো? কমল টাওয়ালে হাত মুছে বলে, আহ্ কি খাওয়ালে ডিম ওয়ালা চিংড়ী শাপলা আর সর্ষে দিয়ে ভাজাকারি আর পদ্মার ইলিশ মাছে টক দেওয়া কারী বহুদিন পরে খেলাম। মিথিলার মজার রান্না অনেক দিন মনে থাকবে। আসলে মিথিলা রান্না ভালই করে। শংকরের এই কথায় মিথিলা গর্ব অনুভব করে। অঞ্জনা বউদি কমল দাদাকে ভাল কিছু রান্না করে খাওয়াতে পারেনা সেটা মিথিলা ভাল করে বুঝতে পারে। কমল বলল, মিথিলা তুমি খেলেনা? আমাদের সাথে তো খেয়ে নিতে পারতে। মিথিলা বলল, না পরেই খাব। আমার মেয়ে বিপাশা ও ছেলে রনি আসতেছে ওর বন্ধুদের নিয়ে। আমি ওদের সাথেই খেয়ে নেব। শংকর জিজ্ঞেস করে ওরা কখন আসবে? মিথিলা বলে ওরা দুটো-আড়াইটার মধ্য এসে পড়বে। শংকর ঘড়ি দেখে বলে দুটো তো বাজেই। মিথিলা বলে, আমাকে ফোনে বলেছে, মা আমার তিনজন বন্ধুকে সাথে নিয়ে দুটো থেকে আড়াইটার মধ্যে আসতেছি। আমরা দুপুরে খাব। *(চলমান)*

তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
সাধু যোহন বাপ্তিস্ত ভবন, মাদার তেরেজা সরণী, তুমিলিয়া মিশন
পো: অ: কালীগঞ্জ-১৭২০, জেলা: গাজীপুর, বাংলাদেশ
মোবাইল: ০১৭১১-৫৩৮৬৫৫,
ই-মেইল: ঃcccul@yahoo.com

TUMILIA CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.
Estd : 1964
St. John Baptist Bhaban, Mother Teresa Saronee
Tumilia Mission, P.O. Kaligonj-1720
Dist: Gazipur, Bangladesh.

সেক্রেটারি ২০২৫/২৬ (৩৫)

তারিখ: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

৫৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যা ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৪ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সকাল ০৯:০১ মিনিটে সাধু মাইকেল পালকীয় মিলনায়তন, তুমিলিয়া মিশন, কালীগঞ্জ, গাজীপুর-এ অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের ৫৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতার মাধ্যমে সফল ও স্বার্থক করে তোলার জন্য সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আলোচ্যসূচী

১। রেজিস্ট্রেশন ও উপস্থিতি গণনা, আসন গ্রহণ, জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন, পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ ও প্রার্থনা;
২। পরলোকগত সদস্য-সদস্যাদের আত্মার কল্যাণার্থে এক মিনিট নীরবতা পালন;
৩। চেয়ারম্যানের স্বাগত বক্তব্য;
৪। প্রধান অতিথি ও অন্যান্য সম্মানিত অতিথিদের বক্তব্য;
৫। ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন;
৬। ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রমের উপর বাৎসরিক রিপোর্ট পর্যালোচনা;
৭। বার্ষিক হিসাব বিবরণী বিবেচনা ও অনুমোদন;
৮। উদ্বৃতপত্র ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
৯। পরবর্তী আর্থিক বৎসরের জন্য প্রাক্কলিত বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
১০। ঋণ গ্রহণের সবোর্চ্চ সীমা নির্ধারণ;
১১। তুমিলিয়া গ্রামে ভবন নির্মাণের অনুমোদন প্রসঙ্গে;
১২। ঋণদান পরিষদের বার্ষিক রিপোর্ট পর্যালোচনা;
১৩। পর্যবেক্ষণ পরিষদের বার্ষিক রির্পোট পর্যালোচনা;
১৪। শিক্ষা কমিটির বার্ষিক রিপোর্ট পর্যালোচনা;
১৫। বিবিধ;
১৬। কোরামপূর্তি লটারি, সহযোগী সদস্য লটারি ও সাধারণ লটারি ড্র (শুধু উপস্থিত নিয়মিত সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে);
১৭। ভাইস চেয়ারম্যান কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপ্তি ঘোষণা;
১৮। মধ্যাহ্ন ভোজ।

সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের সকাল ৮:০১ মিনিট হতে ১১টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য অনুরোধ করছি। রেজিস্ট্রেশনের জন্য সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত পাশ বই অথবা আই কার্ড সাথে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোরাম পূর্তি লটারিতে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে এবং কোরাম পূর্তির সাথে সাথেই লটারী ড্র অনুষ্ঠিত হবে। কোরাম পূর্তি লটারীর পুরস্কার শুধু উপস্থিত সদস্যগণই প্রাপ্য হবেন।

সহযোগী সদস্যদের ক্ষেত্রে অভিভাবকগণ উপস্থিত হলেই রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সমবায় সমিতি (সংশোধিত) আইন ২০১৩ এর ৩৭ ধারা মোতাবেক কোন সদস্য-সদস্যা ক্রেডিট ইউনিয়নে শেয়ার ও ঋণ খেলাপী হলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য-সদস্যা সাধারণ সভায় তাঁর অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

অনুলিপি: (১) জেলা সমবায় অফিসার, গাজীপুর; (২) উপজেলা সমবায় অফিসার, কালীগঞ্জ, গাজীপুর; (৩) তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: এর সকল সদস্য-সদস্যা।

ধন্যবাদান্তে,

সামুয়েল আলেকজান্ডার রোজারিও
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা কমিটি

বিজ্ঞ/২২৭/২৫

আলোচিত সংবাদ

প্রবীণরা সমাজের বোঝা নন, তারা হলেন জীবন্ত ইতিহাস'- প্রধান উপদেষ্টা

প্রবীণদের জন্য আত্মনির্ভরশীল ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের সুযোগ সৃষ্টিতে অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। মঙ্গলবার 'আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি বলেন, প্রবীণরা কোনো সমাজের বোঝা নন, বরং তারা জীবন্ত ইতিহাস, যাদের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিকনির্দেশনা। ড. ইউনূস বলেন, জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে বৈষম্যহীন ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার পথে দেশ এগোচ্ছে, সেখানে প্রবীণদের জ্ঞান ও কর্মদক্ষতাকে কাজে লাগাতে হবে। তিনি জানান, প্রবীণরা যেন সামাজিক সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখতে পারেন, সে পরিবেশ তৈরি করা হবে। ড. ইউনূস আহ্বান জানান, প্রবীণদের সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের সক্রিয় অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করে এমন এক পৃথিবী গড়ে তুলতে, যেখানে প্রতিটি মানুষ মর্যাদার সঙ্গে পরিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে।

তথ্যসূত্র: https://dainikamadershomoy.com/details/0199bca548c9

ভাষাসংগ্রামী আহমেদ রফিক আর নেই

ভাষা আন্দোলনের অগ্রণী সদস্য, কবি ও গবেষক আহমদ রফিক ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের ২ অক্টোবর রাতে ঢাকা শহরে বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানান, তিনি লাইফ সাপোর্টে ছিলেন এবং রাত ১০টা ১২ মিনিটে মৃত্যুর ঘোষণা করা হয়। মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশ হতেই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মহল শোক প্রকাশ করে। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস শোকবার্তায় বলেন, রফিক ভাষা আন্দোলনের অগ্রগণ্য সাক্ষী ও গবেষক ছিলেন, তাঁর প্রয়াণ দেশ ও সংস্কৃতিতে অপূরণীয় ক্ষতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা দল সহ বহু সংগঠন ও ব্যক্তিরাও শোকপ্রকাশ করেছে। মরদেহ শহীদ মিনারে এনে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপর রফিকের নিজে ইচ্ছাপূরণ ঘটে – মেডিকেল শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ ও গবেষণার কাজে দেহ দান করা হয়। এভাবে শেষকৃত্য সম্পন্ন হলে ভাষা সংগ্রামী আহমদ রফিককে বড় মর্যাদায় অভিবাদন জানানো হলো, যিনি জীবনে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।

তথ্যসূত্র: https://www.prothomalo.com/bangladesh/r7qqba2ifz

জ্বর হলে ডেঙ্গু পরীক্ষার অনুরোধ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে দেশে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। রোববার (৫) সকাল পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে ৯ জন মারা গেছেন এবং হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১ হাজার ৪২ জন–যা চলতি বছরের সর্বোচ্চ। এ পরিস্থিতিতে জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে 'এনএস-ওয়ান' পরীক্ষা করানোর আহ্বান জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সর্বশেষ যেসব রোগীর মৃত্যু হয়েছে, তাদের ৭ জন হাসপাতালে ভর্তির প্রথম দিনেই মারা গেছেন। দেরিতে হাসপাতালে আসার কারণেই ডেঙ্গু জটিল আকার নিচ্ছে এবং চিকিৎসা দেওয়ার যথেষ্ট সময় মিলছে না। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায়, সব হাসপাতালে পর্যাপ্ত ডেঙ্গু পরীক্ষার কিট, স্যালাইন ও ওষুধ মজুত রয়েছে। মৃত্যু কমাতে দ্রুত রোগ শনাক্তকরণ, গাইডলাইন অনুযায়ী চিকিৎসা এবং কার্যকর মশক নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ বছর এখন পর্যন্ত সারাদেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৪৯ হাজার ৯০৭ জন এবং মারা গেছেন ২১২ জন।

তথ্যসূত্র: https://bangla.bdnews24.com/health/f5dd1586e5cc

আফগানিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করল বাংলাদেশ

আফগানিস্তানের বিপক্ষে টানা তৃতীয় জয়ে হোয়াইটওয়াশ নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ। শারজাহতে অনুষ্ঠিত শেষ টি-টোয়েন্টিতে জাকের আলীর দল ৬ উইকেটের দাপুটে জয় তুলে নেয়। ১৪৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে সাইফ হাসানের ঝড়ো ইনিংসে জয় পায় টাইগাররা। ৩৮ বলে অপরাজিত ৬৪ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন সাইফ, যেখানে ছিল ৭টি ছক্কা। শুরুতে পারভেজ ইমন ১৪ ও তানজিদ হাসান ৩৩ রান করে আউট হলেও মাঝের ওভারে সাইফের ব্যাটে পাল্টে যায় ম্যাচের চিত্র। এর আগে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে আফগানিস্তান গুটিয়ে যায় ১৩২ রানে। শরিফুল ইসলামের গতিবিধি ও নাসুম আহমেদের ঘূর্ণিতে চাপে পড়ে তারা। সেদিকুল্লাহ অটল ২৪, রাসুলি ৩২ ও মুজিব ২৩ রানে কিছুটা প্রতিরোধ গড়লেও তা যথেষ্ট হয়নি। বাংলাদেশের বোলিংয়ে শরিফুল ও নাসুম নেন ২টি করে উইকেট। ব্যাটে-বলে সমান আধিপত্যে টাইগাররা তুলে নেয় দারুণ জয়, নিশ্চিত করে আফগানদের বিপক্ষে ঐতিহাসিক হোয়াইটওয়াশ।

তথ্যসূত্র: https://www.banglanews24.com/cricket/news/bd/1606481.details

দ্রুত গাজা শান্তি আলোচনা এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান ট্রাম্পের

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মধ্যস্থতাকারীদের বেগবান হয়ে গাজা যুদ্ধ অবসানের জন্য শান্তি আলোচনা দ্রুত এগিয়ে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। মিশরে এই পরোক্ষ আলোচনা শুরু হওয়ার আগেই ট্রাম্প বলেন, প্রথম পর্যায়ের আলোচনাগুলো এই সপ্তাহেই শেষ হওয়া উচিত এবং সবাই যেন দ্রুত এগোয় তা তিনি চান। এ আলোচনা হামাসের কিছু অংশে সম্মতির পরে শুরু হয়েছে; এতে জিম্মিদের মুক্তি ও গাজার শাসন প্রযুক্তোক্র্যাটদের কাছে হস্তান্তরসহ বিভিন্ন বিষয় আলোচনা হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতেও ইসরা য়েলি বিমান হামলা এখনো চলছে, যা দ্রুত শনীতলের প্রয়োজনীয়তা আরও জোরালো করে তোলে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী (সাবেক) মার্কো রুবিওও বলেছেন, জিম্মিদের নিরাপদ মুক্তির জন্য অন্তত বোমা হামলা স্থগিত থাকা প্রয়োজন। মধ্যস্থতাকারীরা একত্রিত হলে ট্রাম্প প্রত্যেকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, সময় এসেছে, নতুবা ব্যাপক রক্তপাত হতে পারে–এমন উদ্বেগও ব্যক্ত করেছেন। এ ক্ষণস্থায়ী পদক্ষেপগুলোই যদি সফল হয়, তাহলে তা গাজার জনসাধারণের জন্য মানবিক সহায়তা বাড়াতে এবং বন্দি-বিনিময়ে অগ্রগতি আনতে পারে।

তথ্যসূত্র: https://www.jagonews24.com/international/news/1057211

দড়িপাড়া খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
স্থাপিত: ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ, রেজি নং- ৮৩/২০০৭,
সংশোধিত রেজি নং-০৩/২১
গ্রাম: দড়িপাড়া, পো: অ: কালীগঞ্জ-১৭২০
উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর, বাংলাদেশ।
মোবাইল: ০১৮৩২৭৬৭০২৪, ০১৭৩১৩৯৪৯২১

DARIPARA CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.
Estd: 2004, Reg No. 83/2007,
Amended Reg No. 03/2021
Vill: Daripara, P. O. Kaligonj-1720
Upazila: Kaligonj, Dist: Gazipur, Bangladesh
Mob: 01832767024, 01731394921
E-mail:dcccul@yahoo.com

২১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই ২০২৪ হতে ৩০ জুন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

তারিখ: ১৪ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, সময়: সকাল ৯:০১ মিনিট

স্থান: সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়, দড়িপাড়া।

এতদ্বারা দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যা ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী **১৪ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ** রোজ শুক্রবার সকাল ৯:০১ মিনিটে **সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে** অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থেকে ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভাকে সফল ও স্বার্থক করে তোলার জন্য সকল সদস্য/সদস্যাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে -

ডেনিস আলেকজান্ডার কস্তা
চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা কমিটি
দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো- অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

সোহেল থিউটনিয়াস রোজারিও
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা কমিটি
দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো- অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/২২৮/২৫

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

২০২৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের পুণ্য দেহাবশেষ প্রদর্শন সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে

মণ্ডলী ও সারাবিশ্ব যেদিন আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের পর্ব পালন করে সেদিনই আসিসির সাক্রো কনভেন্তো থেকে ঘোষণা এসেছে যে, সাধুর পুণ্য দেহাবশেষ প্রদর্শনের উদ্দেশে জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের ৮০০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে, তাঁর দেহটি ফ্রান্সিসকান গির্জার নীচতলায় ক্রিপ্টে অবস্থিত সমাধি থেকে বের করে নীচে পোপীয় (পাপাল) বেদীর পাদদেশে স্থাপন করা হবে। এ অনুমোদন দেবার জন্য পুণ্যপিতা চতুর্দশ লিও'কে ধন্যবাদ জানানো হয়।

আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের মরদেহের প্রথম দীর্ঘমেয়াদী অর্থাৎ একমাসব্যাপী প্রকাশ্য প্রদর্শন শুরু হবে ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২২ মার্চ ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর মৃত্যুর ৮০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা এসে আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের মরদেহ দেখার সুযোগ পাবে। সাক্রো কনভেন্তো এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, এটি একটি দারুণ উপহার, প্রার্থনার প্রতি এক গভীর আহ্বান এবং একটি অপূর্ব সুযোগ- যার মাধ্যমে আমরা দেখতে পারি, কীভাবে খ্রিস্টের মঙ্গলসমাচার একজন সাধারণ মানুষের জীবনে পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। আজ ৪ অক্টোবর, ফ্রান্সিসকান ধর্মসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও ইতালির প্রতিপালক আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের পর্বদিবসে এই ঘোষণাটি প্রকাশ করা হয়েছে। বীজ মরে গিয়েও ফল দেয় - মঙ্গলসমাচারীয় এই ভাবনাকে ভিত্তি করে প্রদর্শনের চিন্তা যা সকলকে সাধুর জীবন ধ্যান করতে, যে জীবন ৮০০ বছর যাবত ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব প্রকাশ করেছে এবং এখনও শান্তি, ভ্রাতৃত্ব, দরিদ্রদের সেবা, আনন্দ ও সৃষ্টির যত্ন নিতে মানবজাতিকে অনুপ্রাণিত করছে।

সকলের জন্য উন্মুক্ত এক যাত্রা: সাধু ফ্রান্সিসের ৮০০তম মৃত্যুবার্ষিকী হবে স্মরণ ও পুনর্নবীকরণের একটি সময়, জীবনকে উদ্‌যাপন করার উপলক্ষ্য যা নিজেকে নিবেদন ও উৎসর্গ করার মধ্যদিয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে; এটি মাটিতে রোপিত সেই বীজের মতো যা আজও শান্তি, বিশ্বাস ও ভালোবাসার ফল দিচ্ছে। এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো: সাধু ফ্রান্সিস বেঁচে আছেন। এই ভাবধারার আলোকে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভাটিকানের সেক্রেটারিয়েটের মাধ্যমে পুণ্যপিতা চতুর্দশ লিও'র অনুমোদনে আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের মৃতদেহ জনসম্মুখে প্রদর্শনী আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের বাসিলিকায় অনুষ্ঠিত হবে।

সাধুর মৃতদেহ দেখতে অনেক মানুষের সমাগম ঘটবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। তাই সকলেই যেন ভক্তিপূর্ণ ও যথাযথভাবে প্রদর্শন সম্পন্ন করতে পারে তার জন্য অনলাইন রির্জাভেশন ফ্রি এবং আবশ্যিক করা হয়েছে। রির্জাভেশনের লিঙ্কটি হলো: www.sanfrancescovive.org। সাধুর পুণ্যদেহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রর্দশনে সকলের জন্য একটি সহজ পথ নির্ধারিত হয়েছে, যা ব্যক্তিগতভাবে বা দলগতভাবে সাক্ষাতের সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে। রির্জাভেশনের সময় তীর্থযাত্রীরা দু'টি থেকে একটি বেছে নিতে পারবেন। দলগত সাক্ষাতে একজন ফ্রান্সিসকান সন্ন্যাসী (ফ্রায়ার) সাথে থাকবেন এবং আধ্যাত্মিকতার উপর সংক্ষিপ্ত অনুধ্যান রাখবেন; ব্যক্তিগত সাক্ষাতে নীরবতা ও ব্যক্তিগত প্রার্থনাই প্রাধান্য পাবে। শ্রদ্ধা নিবেদনের শেষে একটি সংক্ষিপ্ত উপাসনা হবে এবং প্রত্যেক তীর্থযাত্রী ফ্রান্সিসকান ধর্মসংঘ থেকে একটি উপহার পাবে। চলাফেরায় অসুবিধা বা দৃষ্টির কোন সমস্যায় ভোগা ব্যক্তিদের বিশেষ যত্ন নেওয়া হবে এবং তাদের চলাচলের উপযোগী পথের ব্যবস্থা করা হবে। সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত সকাল ১১টা ও বিকাল ৫টায় দু'টি ইন্টারন্যাশনাল খ্রিস্টযাগ করা হবে।

উল্লেখ্য ৪ অক্টোবর সাধু ফ্রান্সিসের পর্বদিবস পালনে আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের বাসিলিকায় ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জা মেলোনি উপস্থিত ছিলেন। সম্প্রীতি ইতালিয়ান পার্লামেন্ট ফ্রান্সিসকান মূল্যবোধ শান্তি, ভ্রাতৃত্ব ও সৃষ্টির যত্নের প্রতি সম্মান জানিয়ে ৪ অক্টোবর সাধু ফ্রান্সিসের পর্বদিবসে রাষ্ট্রীয় ছুটি ঘোষণা করেছে।

- তথ্যসূত্র : news.va

STUDY/ WORK PERMIT/ MIGRATION VISA

STUDENT VISA	Japan/ S. Korea/ Canada/ UK/ Australia/ Romania Norway/ Denmark/ Sweden & other Schengen countries.
WORK PERMIT	Romania/ Poland / Slovakia / Japan No Work Permit-No Loss of Money.
MIGRATION VISA	USA/ Canada/ Europe/ Japan
VISIT VISA	USA / UK / Canada /Australia / Japan & India

গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমী
(আপনার স্বপ্ন পূরণের একান্ত সহযোগী)

আগ্রহী প্রার্থীগণ আজই যোগাযোগ করুন :

+8801901-519721
+8801901-519722
+8801901-519725

ঠিকানাঃ গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমি, বাড়ি # ১১ (৩য় তলা), রোড # ২/ই, ব্লক-জে, বারিধারা, ঢাকা-১২১২, (আমেরিকান দূতাবাসের পূর্বপাশে, বাঁশতলা বাসস্ট্যান্ডের সন্নিকটে)

প্রয়োজনে আমরা ব্যাংকিং ও স্পন্সরশিপ সহযোগিতা দিয়ে থাকি।

আমরা একমাত্র খ্রিস্টান মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বিগত 22 বছর যাবৎ দক্ষতা, পেশাদারিত্ব ও সফলতার শীর্ষে অবস্থান করছি।

@globalvillageacademybd
WWW.globalvillagebd.com
info@globalvillagebd.com

বিজ্ঞ/২৩০/২৫

জপমালা প্রার্থনা: "পরিবারের দ্বন্দ্ব; বন্ধ হওয়ার হাতিয়ার"

দুলেন্দ্র ডানিয়েল গমেজ

গ্রামটির নাম আনন্দপুর। খুবই সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর একটি গ্রাম। গ্রামটি দেখলেই মনে হবে কোন বিখ্যাত শিল্পী তাঁর তুলির পরশে গ্রামটি এঁকেছেন। এই গ্রামে সুন্দরী একটি মেয়ে বাস করে। মেয়েটির নাম অবন্তী। সে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। তার বাবা একজন দিনমজুর, মা ঘরে কাজ করেন। তারা চার ভাই-বোন, বড় অবন্তী, মেঝো অপূর্ব, অপরূপা এবং ছোট অনিক। এই ছয় জনের সংসার নির্মলবাবু ভালো- ভাবেই পরিচালনা করছিলেন। মা শ্রাবন্তী, খুব সুন্দর করে সংসারটি সাজিয়েছেন। অন্যদিকে, অবন্তী খুবই ভালো মেয়ে। সে প্রতিদিন খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করে এবং পড়াশোনায়ও সে ভাল। অবন্তীদের পরিবারে সবই আছে, নেই শুধু শান্তি। কারণ অবন্তীর বাবা বেশি ভাল মানুষ ছিলেন না। তিনি বাড়ীতে ফেরার পথে প্রায়ই মদ পান করে নেশা গ্রস্থ হয়ে ফিরতেন। বাড়ীতে এসেই তার স্ত্রীকে অনেক জ্বালাতন করতেন। প্রতিদিন নির্মলবাবু একই কাজ করতেন। তিনি প্রত্যেকদিন স্ত্রী সাথে ঝগড়া করতেন, খারাপ খারাপ গালি দিতেন এবং মাঝে মধ্যে মারও দিতেন। কিন্তু সবই নীরবে সহ্য করতেন অবন্তীর মা। এসব দেখে অবন্তী মনঃকষ্টে ভোগতো। সে প্রতিদিন খ্রিস্টযাগে গিয়ে তার বাবার মন পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করত কিন্তু তার বাবার কোনো পরিবর্তন হচ্ছিল না। অবন্তী প্রতিদিন তার ভাই-বোনদের নিয়ে ঠিক সময়ে খ্রিস্টযাগে যায় কিন্তু একদিন সে একটু আগে গির্জায় গেল আর খ্রিস্টযাগে যোগদান করল। সে তার বাবার মন ও আচরণ পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনায় মগ্ন হয়ে রইল। কারণ সেটি ছিল অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ আর এ সপ্তাহেই জপমালা রাণী মা-মারীয়ার পর্ব পালন করা হয়। এ মাসে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ভক্তিসহকারে জপমালা প্রার্থনা করলে অনেক আশ্চর্য ফলও পাওয়া যায়। সেদিন খ্রিস্টযাগে ফাদারও জপমালা প্রার্থনার উপর উপদেশ দিলেন। অবন্তী খ্রিস্টযাগ শেষ করে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে যায় এবং বাড়ী গিয়ে দেখে বাবা কাজে না গিয়ে মার সাথে ঝগড়া করছেন আর তার মা রান্নাঘরে বসে কাঁদছেন। সে মায়ের কাছে গিয়ে বসে এবং তার মায়ের চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বলে, মা এটা অক্টোবর মাস, "জপমালা রাণীর মাস"। আমরা যদি প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা সবাই মিলে জপমালা প্রার্থনা করি তাহলে অবশ্যই বাবার মন পরিবর্তন হবে। আজ থেকেই আমরা জপমালার প্রার্থনা করব। সেদিন থেকেই তারা মালার প্রার্থনা শুরু করল। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা তারা সবাই একত্রে জপমালার প্রার্থনা করে। দেখতে দেখতে মাস প্রায় শেষ। অবন্তীর বাবার মনে আমূল পরিবর্তন। সে এখন কারও সাথে ঝগড়া করে না। সে প্রতিদিন পরিবারে সকলের সাথে জপমালা প্রার্থনা করে। বাবার মন পরিবর্তনের সাথে সাথে অবন্তী কিন্তু জপমালা রাণীকে ভুলে যায়নি। তারা সবসময় জপমালা প্রার্থনা করে চলছে। এই ভাবেই জপমালা প্রার্থনাই হয়ে উঠলো অবন্তীদের পরিবারের দ্বন্দ্ব, বন্ধ হওয়ার হাতিয়ার।

তীর্থযাত্রীর রাণী মারীয়া

সপ্তর্ষি

গভীর অরণ্য পেরিয়ে পর্বত পাহাড়ে চড়ে
চলেছে তীর্থযাত্রী পুণ্যের পথ খুঁজতে
চোখ ভরা স্বপ্ন আর মনে আশা শান্তির
হৃদয় জুড়ে রয়েছে তার অশেষ ভক্তি।

দূর্গম পাথরে পথ, খরস্রোতা নদীর ঢেউ
ভক্তির স্রোতে নিস্তব্দ চঞ্চল পায়ে পায়ে
রাতের গভীরে চাঁদের আলোতে হেঁটে চলা

নিরবতার মাঝে ভাসে যেন মায়ের বন্দনা।
দু'হাত জোর করে প্রার্থনাতে মন ভরে
চলার পথ যেন হয়েছে আর্শীবাদের ধারা
তীর্থযাত্রীর রাণী আলো দেয় হৃদয়ে ঢালি
মা-মারীয়ার নামের মহিমা বন্দনা করি।

জপমালার রাণী মা মারীয়া

নব কস্তা

মধুর মুখে হাসি লেগে,
দেখেন মা আমাদের দিকে।
জপমালা হাতে নিয়ে,
ডাকবো মাকে হৃদয় ভরে।

পবিত্র মা, মারীয়া নাম,
তোমার গুণে জাগে প্রেমধাম।
যিশুর পথ দেখাও হে মা,
ভালোবাসা শেখাও সবার।

তুমি রাণী, তুমি আলো,
তুমি যে মা সবচেয়ে ভালো।
তোমার আশীর্বাদ থাকুক সবার,
শান্তি আর প্রেমে ভরে যাক আবার।

শিশুদের জন্য জানা অজানা বিষয়

১) যে শক্তি আমাদের মাটিতে রাখে তাকে কি বলে?

উত্তর: মহাকর্ষ।

২) শিলা অধ্যয়নকারী একজন বিজ্ঞানীকে আপনি কী বলবেন?

উত্তর: ভূতত্ত্ববিদ।

৩) তরলকে বাষ্পে পরিণত করার প্রক্রিয়া কী?

উত্তর: বাষ্পীভবন।

৪) আফ্রিকার দীর্ঘতম নদীর নাম কি?

উত্তর: নীল নদ।

৫) বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা কোন দেশের?

উত্তর: চীন।

৬) আমাজন রেইনফরেস্ট কোন মহাদেশে অবস্থিত?

উত্তর: দক্ষিণ আমেরিকা।

৭) মিল্কিওয়ের কোন গ্রহটি সবচেয়ে উষ্ণ?

উত্তর: শুক্র।

৮) বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভবন কোন দেশে অবস্থিত?

উত্তর: দুবাই (বুর্জ খলিফা)।

৯) মহাকাশে যাত্রা করা প্রথম মানব কে?

উত্তর: ইউরি গ্যাগারিন।

১০) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কত সালে হয়?

উত্তর: ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে।

১১) মানব দেহের সবচেয়ে বড় অঙ্গ কোনটি?

উত্তর: ত্বক।

১২) কাগজ ভাঁজ করার শিল্পকে কি বলা হয়?

উত্তর: অরিগামি।

তথ্যসূত্র: https://ahaslides.com/bn/blog/general-knowledge-questions-for-kids/

ঢাকা অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হলো PWPN-এর সেমিনার

দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ: গত ২২ আগস্ট মোহাম্মদপুরে পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে পিডব্লিউপিএন বাংলাদেশ-এর বৃহত্তর ঢাকা শহর অঞ্চলের প্রতিনিধিদের সেমিনার। এ সেমিনারের প্রতিপাদ্য ছিল "পবিত্র খ্রিস্টযাগই জীবনের মূল ও আশার উৎস"। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বাংলাদেশ জেজুইট সংঘের সুপিরিয়র ফাদার রিপন রোজারিও এসজে এবং সহযোগিতা করেন সেন্ট খ্রীষ্টিনা গির্জার পুরোহিত ফাদার কাজল পিউরীফিকেশন। পরে সকাল ১০টায় সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে উদ্বোধনী নৃত্যের মাধ্যমে সেমিনারের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। নয়টি ধর্মপল্লী থেকে আগত প্রতিনিধিদের নিয়ে সেমিনারের উদ্বোধন করেন পিডব্লিউপিএন বাংলাদেশ-এর ডিরেক্টর ব্রাদার সুবল এল রোজারিও সিএসসি, সেমিনারের আহ্বায়ক সিস্টার কল্পনা কস্তা সিএসসি এবং ফাদার রিপন রোজারিও এসজে। সেমিনারে ব্রাদার সুবল পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে পিডব্লিউপিএন-এর ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বলেন, পিডব্লিউপিএন হলো পোপের সাথে একান্ত হয়ে সারাবিশ্বের মানুষের জন্য প্রার্থনা করার এক মহা আন্দোলন। এ আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে সুদূর ফ্রান্স দেশে এবং চলতি বছর সেখানে ১৮০ বছরের জুবিলী উদ্‌যাপন করা হয়।" তিনি আরও বলেন, "বাংলাদেশ পিডব্লিউপিএন-এর যাত্রা শুরু হয় ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে। ফাদার মিল্টন জে রোজারিও প্রথমে দায়িত্বে ছিলেন। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ বিশপ সম্মিলনী আমার কাছে এর দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। বর্তমানে ৯০টি দেশ পিডব্লিউপিএন-এর সদস্য। বাংলাদেশ এর সর্বশেষ সদস্য দেশ।" সেমিনারে প্রার্থনার গুরুত্ব তুলে ধরে ফাদার রিপন বলেন, "গভীর বিশ্বাস ও ভক্তি নিয়ে আমাদের প্রতিদিন প্রার্থনা করতে হবে।" এসময় তিনি বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনার কিছু বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "পবিত্র খ্রিস্টযাগে দেহ, মন ও আত্মা পরিশুদ্ধ হয়। আর খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ হলো খ্রিস্টভক্তদের জন্য সবচেয়ে বড় প্রার্থনা।" সেমিনারে সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন চিত্রা রোজারিও এবং ববি রিবেরু। এরপর পর্যায়ক্রমে সুবাস আগষ্টিন পিউরীফিকেশন-এর পরিচালনায় দলীয় আলোচনা এবং দাঁড়িয়ে একযোগে গান গাওয়ার মাধ্যমে সেমিনারের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের সমাপ্তি হয়।

রাজশাহীতে পোপের বিশ্বব্যাপী প্রার্থনা নেটওয়ার্ক বিষয়ক সেমিনার-২০২৫

ফাদার অনিল ইগ্নেসিউস মারাণ্ডী: গত ৩ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার হলিক্রস স্কুল এ্যান্ড কলেজ রাজশাহীতে, "পোপের বিশ্বব্যাপী প্রার্থনা নেটওয়ার্ক (Pope's Worldwide Prayer Network, PWPN)" বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী কাথলিক ধর্মপ্রদেশে প্রথমবারের মত রাজশাহীর কো-অর্ডিনেটর ফাদার অনিল ইগ্নেসিউস মারাণ্ডীর নেতৃত্বে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী কাথলিক ধর্মপ্রদেশের মধ্য ভিকারিয়ার বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে সিস্টার, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সাধারণ খ্রিস্টভক্ত ও যুবক-যুবতীদের নিয়ে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারে মোট ৬০ জন অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারের শুরুতে অতিথি ও অংশগ্রহণকারীগণ আসন গ্রহণের পর ছোট প্রার্থনা, পবিত্র বাইবেল পাঠ ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে সেমিনারের যাত্রা শুরু হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন প্রধান অতিথি রাজশাহী কাথলিক ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মারাণ্ডী, ফাদার অনিল ইগ্নেসিউস মারাণ্ডী, ব্রাদার তরেন যোসেফ পালমা সিএসসি, সিস্টার আরতি এসএমআরএ, সিস্টার মারীয়া এসসি ও ১জন শিক্ষিকা এবং ১জন অংশগ্রহণকারী। ফাদার অনিল ইগ্নেসিউস মারাণ্ডী ও হলিক্রস স্কুল এ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ব্রাদার তরেন যোসেফ পালমা সিএসসি উদ্বোধনীর স্বাগত বক্তব্য রাখেন। পরবর্তীতে ফাদার অনিল ইগ্নেসিউস মারাণ্ডী "পোপের বিশ্বব্যাপী প্রার্থনা নেটওয়ার্ক" এর সংক্ষিত ইতিহাস, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও বাংলাদেশ মণ্ডলীতে এর সূচনা ও কার্যক্রমের উপর উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, পোপের বিশ্বব্যাপী প্রার্থনা নেটওয়ার্ক হলো একটি মুভমেন্ট ও পোপের বিশ্বব্যাপী প্রার্থনা সম্প্রচার ব্যবস্থা। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক প্রাক্তন প্রেরিত প্রার্থনার শিষ্যত্বের (Apostleship of Prayer) নতুন নাম। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের (Vals-Pres-le Puy G-তে) এই আন্দোলনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন Fr. Francis Gautrelet, SJ। এরপর আন্তন শিপলু বিশ্বাস "EYM (Eucharistic Youth Movement) "- এর সংক্ষিত ইতিহাস, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও খ্রিস্টমণ্ডলীতে এর সূচনা ও কার্যক্রমের উপর উপস্থাপন করেন। অংশগ্রহণকারী সবিতা টুডু ও প্রদীপ মুরমু (PWPN ও EYM)-এর সম্পর্কে তাদের মতামত এবং অনুভূতি ব্যক্ত করেন। পরিশেষে রাজশাহী কাথলিক ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মারাণ্ডী পবিত্র খ্রিস্টযাগে উৎসর্গ করেন ও সহযোগিতা করেন ফাদার অনিল ইগ্নেসিউস মারাণ্ডী। খ্রিস্টযাগের পোপ চতুর্দশ লিও -এর ছবি অংশগ্রহণকারীগণকে উপহার দেওয়া হয়। শেষে ফাদার অনিল ইগ্নেসিউস মারাণ্ডী সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অর্ধদিবসব্যাপী সেমিনারের সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

মেরিল্যান্ডে বাংলা বাজারের উদ্‌যাপিত হলো পঞ্চ বর্ষপূর্তি

সিলভার স্প্রিং, এমডি: গত ২৭-২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে মেরিল্যান্ডে বাংলাদেশি কমিউনিটির জনপ্রিয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাংলা বাজার হালাল মাংসের গ্রোসারির বর্তমান স্বত্বাধিকারীদের পথচলার পাঁচ বছর পূর্তি সফলভাবে উদ্‌যাপন করা হয়েছে। দুই দিনব্যাপী আয়োজনে ছিল মেগা সেল, মিলনমেলা, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র। প্রথম দিন, শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, বেল্টসভিলের বাংলা বাজার স্টোরে অনুষ্ঠিত হয় দিবসব্যাপী মেগা সেল। প্রতিটি দেশীয় পণ্যের বিশেষ ছাড় এবং প্রতিটি কেনাকাটায় ফ্রি র‍্যাফেল টিকিটের কারণে ক্রেতাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

দ্বিতীয় দিন, রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, সিলভার স্প্রিং-এর Roscoe Nix Elementary School-এ অনুষ্ঠিত হয় বাংলা বাজার শারদীয় মিলনমেলা। স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও নতুন উদ্যোক্তাদের আন্তরিক সহযোগিতায় দেশীয় সাজ-পোশাক, কারুশিল্প ও ঐতিহ্যবাহী স্ট্রিট ফুডের স্টল- মেলাকে সমৃদ্ধ করে তোলে। এছাড়া স্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গীত পরিবেশনা, দেশীয় খাবার, মিষ্টি ও পান-সুপারির বাহারি আয়োজন করা হয়। মেলায় ছিল আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র। এছাড়া আরও ১৫টি বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়, যার মধ্যে আকর্ষণীয় পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয় ওয়াশিংটন ডিসি থেকে মেক্সিকোর ক্যানকুন পর্যন্ত বিমান টিকেট। আয়োজক কমিটি জানায়, বাংলা বাজারের বয়স ২১ বছর হলেও বর্তমান স্বত্বাধিকারীদের যাত্রার ৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বে বাংলা বাজারের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বপ্নদ্রষ্টা প্রয়াত স্যামুয়েল শংকর ডি' কস্তা, মধ্যবর্তী স্বত্বাধিকারী প্রয়াত মোঃ কাশেম এবং একনিষ্ঠ কর্মী প্রয়াত বেঞ্জামিন রোজারিও তাঁদেরকে জানানো হয় গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি। এছাড়াও বাংলা বাজারে অবদান রাখার জন্য ক্রেতা, সমাজের বিভিন্ন স্তরের সংগঠন ও ব্যক্তিদের ধন্যবাদ স্মারক দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টম ক্লিফোর্ড, ডিরেক্টর, বিজনেস পার্টনারশিপস প্রোগ্রাম, অফিস অফ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপস, দ্য ইউনিভার্সিটিজ অ্যাট শেডি গ্রোভ এবং স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তা মো. আনিস আহমেদ। পরিশেষে বর্তমান স্বত্বাধিকারী বিভাষ, মার্ক ও বিপুল সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ, সহযোগিতা এবং উপস্থিতির কথা ব্যক্ত করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে শিশুদের নিয়ে জুবিলী বর্ষ উদ্‌যাপন

ফাদার লিয়ন জেভিয়ার রোজারিও: গত ৫ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ, যীশু হৃদয়ের ধর্মপল্লী, রাঙ্গামাটিয়াতে অর্ধদিবস ব্যাপী শিশুদের নিয়ে জুবিলী বর্ষ উদ্‌যাপন করা হয়। এতে প্রায় ২১০ জন শিশু এবং প্রায় ৩০ জন এনিমেটর অংশগ্রহণ করে। ঐ দিন সকাল ১০ ঘটিকায় শিশু এবং এনিমেটরদের নিয়ে পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ফাদার বিকাশ জেমস্ রিবেরু সিএসসি পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন এবং জুবিলী বর্ষের উপর সুন্দর সহভাগিতা রাখেন। এরপর শিশুদের নিয়ে র‍্যালি করা হয় এবং মূলভাবের উপর স্লোগান দেওয়া হয়। ফাদার বিকাশ জেমস্ রিবেরু সিএসসি শিশুদের উদ্দেশে শিশুদের গঠন, পিএমএস এর কার্যক্রম নিয়ে সুন্দর ও অর্থপূর্ণ সহভাগিতা রাখেন। শিশুদের জন্য শ্রেণীভিত্তিক বাইবেল কুইজ এবং শিশুদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্ধদিবস ব্যাপী দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার আলবিন গমেজের সার্বিক তত্ত্বাবধানে শিশু মঙ্গল-এর ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই জুবিলী বর্ষটি পালন করা হয়। পরিশেষে, ফাদার আলবিন গমেজের সমাপনী বক্তব্য এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার মধ্য দিয়ে অর্ধদিবস ব্যাপী জুবিলী উৎসবের সমাপ্তি হয়।

সেন্ট লুইস উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও বিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপন

ফাদার উত্তম রোজারিও: গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট লুইস উচ্চ বিদ্যালয় বোর্ণীতে মহাসমারোহে শিক্ষক দিবস ও বিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় শিক্ষা কমিশনের সেক্রেটারি ফাদার দিলীপ এস. কস্তা ও বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ফাদার আন্তনী হাঁসদা আসন অলংকৃত করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রধান অতিথি ও বিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকদেরকে শিক্ষার্থীরা সাংস্কৃতিক নৃত্যের মধ্য দিয়ে মঞ্চে নিয়ে আসে। এ সময় সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সকলে জাতীয় সংগীত গান পরিবেশন করেন। অতঃপর প্রধান শিক্ষক ফাদার উত্তম রোজারিও স্বাগত বক্তব্যে বলেন, শিক্ষকগণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ধারক। শিক্ষকরা কেবল জ্ঞান দান করেন না, তারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে তোলেন, তাদের কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপিত করেন এবং আশা তৈরি করেন। তিনি সেন্ট লুইস উচ্চ বিদ্যালয়ে সেবাদানরত শিক্ষকদের অবদান, ধৈর্য ও পরিশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাদের শুভ কামনা করেন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, সাধু লুইসের নামে উৎসর্গীকৃত এ বিদ্যালয়টি বিগত অর্ধশতকেরও বেশি সময় ধরে শিক্ষা বিস্তারে অসামান্য অবদান রেখে যাচ্ছে। আর এ কাজে শিক্ষকগণ সর্বদাই সহযোগি হিসেবে সহায়তা দান করে যাচ্ছেন। তাই বিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপনের এই বিশেষ দিনে শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন করার বিষয়টি সত্যিই সুন্দর। সকল শিক্ষককে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তার বক্তব্য সমাপ্ত করেন। এছাড়া সভাপতি মহোদয় শিক্ষকদের অবদানের কথা উল্লেখ করে তার বক্তব্য শেষ করেন। অতঃপর শিক্ষক প্রতিনিধি হিউবার্ট রোজারিও ও সহকারী প্রধান শিক্ষক মার্টিন রড্রিক্স শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সভাপতি, প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং সেন্ট লুইস পরিবারের সকলের মঙ্গল কামনা করেন। বক্তব্যমালা শেষে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে শুরু হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্য-গীত, আবৃত্তি ও অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা প্রকাশ করে।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

"সাফল্যের পথে আরও একধাপ এগিয়ে হাউজিং সোসাইটি"

সোসাইটির মঠবাড়ী প্লট প্রকল্প - ০১

ব্লক-এ, ব্লক-বি, ব্লক-সি, ব্লক- ডি, ব্লক-ই, ব্লক-এফ

প্লটের সাইজ: ৩ কাঠা / ৫ কাঠা / ৭ কাঠা

এখনই বাড়ী নির্মাণ করার উপযোগী

প্লট সংখ্যা সীমিত

এককালীন অথবা কিস্তিতে
প্লট বরাদ্দ চলছে

"হাউজিং সোসাইটিতে বিনিয়োগ দৃশ্যমান বিনিয়োগ"

HOTLINE
01623222555

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
THE METROPOLITAN CHRISTIAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
আর্চবিশপ মাইকেল ভবন, ১১৬/১, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ +৮৮ ০২ ৫৫০২৭৬৯১-৯৪ info@mcchsl.org www.mcchsl.org

বিজ্ঞ/২২৪/২৫

বর্ষ ৮৫ ❖ সংখ্যা - ৩৬
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 36
Regd. No. DA-33
✦ 12 - 18 October 2025, ২৭ আশ্বিন - ২ কার্তিক ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

ফাতেমা রাণীর তীর্থে আমন্ত্রণ

সম্মান্বিত সুধী,

সকলের প্রতি রইল বারমারী ফাতেমা রাণীর তীর্থস্থান থেকে খ্রিস্টীয় প্রার্থনাপূর্ণ শুভেচ্ছা। অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আসছে ৩০-৩১ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বারমারী ধর্মপল্লীতে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও ফাতেমা রাণী মা মারীয়ার তীর্থ উৎসব ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও ভক্তিপূর্ণ পরিবেশে উদ্‌যাপন করা হবে। এ বছরের মূলসুর: "আশার তীর্থযাত্রী: ফাতেমা রাণী মা মারীয়া, বারমারী।"

আপনারা যারা পর্বকর্তা হতে চান, মিশার উদ্দেশ্য ও তীর্থস্থানের উন্নয়নের জন্য অনুদান দিতে আগ্রহী, তারা দয়া করে নিম্নে উল্লেখিত নম্বরগুলোর মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন। পর্বকর্তা সর্বনিম্ন ৫০০ টাকা, মিশার উদ্দেশ্য সর্বনিম্ন ২০০ টাকা।

মা মারীয়ার আশীর্বাদ লাভে আপনি/আপনারা সাদরে আমন্ত্রিত।

খ্রিস্টেতে
ফাদার তরুণ বনোয়ারী (সমন্বয়কারী)
বারমারী ফাতেমা রাণী তীর্থ কার্যকারী কমিটি
ফাদার তরুণ বনোয়ারী : ০১৯১৬-৪২৪৪৩৮ বিকাশ
ফাদার নরবার্ট গমেজ : ০১৬১৮-৩৪৩৬২৭ বিকাশ

অনুষ্ঠানসূচী

অক্টোবর ৩০, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

প্রধান পৌরহিত্যকারীকে (ন্যুনসিও) বরণ : ০৯:৩০ মি.
মণ্ডলীর ও বারমারী তীর্থের জুবিলী উদ্‌যাপন : ১০:৩০ মি.
পুর্নমিলন/পাপস্বীকার : ০২:০০ মি.
পবিত্র খ্রিস্টযাগ : ০৪:০০ মি.
জপমালার আলোর শোভাযাত্রা : ০৮:০০ মি.
সাক্রামেন্টের আরাধনা ও আলোর শোভাযাত্রা : ১১:৩০ মি.

অক্টোবর ৩১, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

জীবন্ত ক্রুশের পথ : ০৮:০০ মি.
মহাখ্রিস্টযাগ : ১০:০০ মি.

বিজ্ঞ/২২২/২৫

ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকীতে তোমায় শ্রদ্ধাঞ্জলি

সময় আমাদের প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দেয় সংসারের সুখ-দুঃখময় স্মৃতিগুলো। আজ সময়ের ধারাবাহিকতায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তোমার চিরবিদায়ের ছয়টি বছর কত দ্রুত চলে গেলো। তুমি আমাদের হৃদয়ে আজও অম্লান হয়ে রয়েছে। তোমাকে কখনও এক মুহূর্তের জন্যে হলেও ভুলে থাকতে পারিনি আমরা। তোমার বিয়োগ ব্যথায় প্রতিনিয়ত কাতর চিত্তে অশ্রুসজলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে চলেছি। ঈশ্বরের পরম ইচ্ছেই তোমাকে কতটা ভালোবেসে তিনি তাঁর রাজ্যে তোমাকে তুলে নিয়ে গেলেন। আমরা বিশ্বাস করি তুমি আজ স্বর্গের অনন্ত রাজ্যে চিরসুখে রয়েছ। তুমি চলে গেলেও তোমার গড়া সংসারে তোমার স্মৃতিগুলো এখনও দীপ্তমান। তুমি আমাদের জন্য ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ প্রদান করো যেন আমরা তোমার আদর্শগুলো আকড়ে ধরে এগিয়ে চলতে পারি। আজ তোমার ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকীতে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

প্রয়াত স্বপ্না ম্যাগডেলিন পেরেরা
জন্ম: ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৫ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
যাকোব মাষ্টার বাড়ী, পুরান তুইতাল
তাসুল্লা, বাংলাবাজার, নবাবগঞ্জ, ঢাকা

শোকার্তচিত্তে তোমারই প্রিয়জন

স্বামী : জর্জ রঞ্জিত পেরেরা
মেয়ে : প্রথমা পেরেরা
বড় ছেলে : প্রয়াস পেরেরা
ছোট ছেলে : প্রতাপ পেরেরা
ভাই : ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ
ও শোকাহত স্বজনবৃন্দ।

বিজ্ঞ/২২৩/২৫

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org